হুমায়ুন আজাদ

জলপাই রঙের অন্ধকার

হুমায়ুন আজাদ বাঙলাদেশের প্রধান প্রথাবিরোধী, সত্যনিষ্ঠ, বহুমাত্রিক লেখক; তিনি কবি ঔপন্যাসিক, ভাষাবিজ্ঞানী, সমালোচক, রাজনীতিক ভাষ্যকার, কিশোরসাহিত্যিক, যাঁর রচনার পরিমাণ বিপুল। জন্ম ১৪ বৈশাখ ১৩৫৪ : ২৮ এপ্রিল ১৯৪৭, বিক্রমপুরের রাড়িখালে। ডক্টর হুমায়ুন আজাদ ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের অধ্যাপক ও সভাপতি। ২০০৪-এর ২৭ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় বাঙলা একাডেমির বইমেলা থেকে ফেরার সময় চাপাতি দিয়ে আক্রমণ ক'রে মৌলবাদীরা তাঁকে গুরুতররূপে আহত করে, কয়েক দিন মৃত্যুর মধ্যে বাস ক'রে তিনি জীবনে ফিরে আসেন। তাঁর জন্যে সারা বাঙলাদেশ এমনভাবে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিলো, যা আর কখনো ঘটে নি। ৭ আগস্ট ২০০৪ PEN-এর আমন্ত্রণে কবি হাইনরিশ হাইনের ওপর গবেষণাবৃত্তি নিয়ে জার্মানী যান। এর পাঁচদিন পর ১২ আগস্ট ২০০৪ মিউনিখস্থ ফ্ল্যাটের নিজ কক্ষে তাঁকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়।

তাঁর প্রকাশিত বই ৬০-র অধিক। তাঁর বইগুলোর মধ্যে রয়েছে–কবিতা: ১৯৭৩ *অলৌকিক ইস্টিমার* ১৯৮০ *জ্বলো চিতাবাঘ* ১৯৮৫ *সব কিছু নষ্টদের অধিকারে যাবে* ১৯৮৭ *যতোই গভীরে যাই মধু যতোই উপরে যাই নীল* ১৯৯০ *আমি বেঁচে ছিলাম অন্যদের সময়ে* ১৯৯৩ *হুমায়ুন আজাদের শ্রেষ্ঠ কবিতা* ১৯৯৪ *আধুনিক বাঙলা কবিতা* ১৯৯৮ *কাফনে মোড়া অশ্রুবিন্দু* ১৯৯৮ *কাব্যসংগ্রহ* ২০০৪ *পেরোনোর কিছু নেই* কথাসাহিত্য : ১৯৯৪ *ছাপ্পান্নো হাজার বর্গমাইল* ১৯৯৫ *সব কিছু ভেঙে পড়ে* ১৯৯৬ *মানুষ হিশেবে আমার অপরাধসমূহ* ১৯৯৬ *যাদুকরের মৃত্যু* ১৯৯৭ *শুভ্রব্রত, তার সম্পর্কিত সুসমাচার* ১৯৯৮ *রাজনীতিবিদগণ* ১৯৯৯ *কবি অথবা দণ্ডিত অপুরুষ* ২০০০ *নিজের সঙ্গে নিজের জীবনের মধু* ২০০১ *ফালি ফালি ক'রে কাটা চাঁদ* ২০০১ *উপন্যাসসংগ্রহ-১* ২০০২ *শ্রাবণের বৃষ্টিতে রক্তজবা* ২০০২ *উপন্যাসসমগ্র-২* ২০০৩ *১০.০০০ এবং আরো ১টি ধর্ষণ* ২০০৪ *একটি খুনের স্বপ্ন* ২০০৪ *পাক সার জমিন সাদ বাদ;* প্রবন্ধ/সমালোচনা : ১৯৯৩ *রবীন্দ্রপ্রবন্ধ/রাষ্ট্র ও সমাজচিন্তা* ১৯৯৩ *শামসুর রাহমান/নিঃসঙ্গ শেরপা* ১৯৮৮ *শিল্পকলার বিমানবিকীকরণ ও অন্যান্য প্রবন্ধ* ১৯৯০ *ভাষা-আন্দোলন : সাহিত্যিক পটভূমি* ১৯৯২ *নারী (নিষিদ্ধ ১৯ নভেম্বর ১৯৯৫);* ১৯৯২ *প্রতিক্রিয়াশীলতার দীর্ঘ ছায়ার নিচে* ১৯৯২ *আমার অবিশ্বাস* ১৯৯৭ *পার্বত্য চট্টগ্রাম : সবুজ পাহাড়ের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হিংসার ঝরনাধারা* ১৯৯৯ *নির্বাচিত প্রবন্ধ* ২০০০ *মহাবিশ্ব* ২০০১ *দ্বিতীয় লিঙ্গ (মূল : সিমোন দ্য বোভোয়ার)* ২০০৩ *আমরা কি এই বাঙলাদেশ চেয়েছিলাম ২০০৪ ধর্মানুভূতির উপকথা ও অন্যান্য* ২০০৫ *আমার নতুন জন্ম* ২০০৬ *আমাদের বইমেলা* ভাষাবিজ্ঞান ১৯৮৩ *Pronominalization in Bengali* ১৯৮৩ *বাঙলা ভাষার শব্রুমিত্র* ১৯৮৪ *বাক্যতত্ত্ব* ১৯৮৪ *বাঙলা ভাষা (প্রথম খণ্ড)* ১৯৮৫ *বাঙলা ভাষা (দ্বিতীয় খণ্ড)* ১৯৮৮ *তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান* ১৯৯৯ *অর্থবিজ্ঞান;* কিশোর সাহিত্য : ১৯৭৬ *লাল নীল দীপাবলি বা বাঙলা সাহিত্যের জীবনী* ১৯৮৫ *ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না* ১৯৮৭ *কতো নদী সরোবর বা বাঙলা ভাষার জীবনী* ১৯৮৯ *আব্বুকে মনে পড়ে* ১৯৯৩ *বুকপকেটে জোনাকিপোকা* ১৯৯৬ *আমাদের শহরে একদল দেবদূত* ২০০৩ *অন্ধকারে গন্ধরাজ* ২০০৪ *Our Beautiful Bangladesh* অন্যান্য ১৯৯২ *হুমায়ুন আজাদের প্রবচনগুচ্ছ* ১৯৯৪ *সাক্ষাৎকার* ১৯৯৫ *আততায়ীদের সঙ্গে কথোপকথন* ১৯৯৭ *বহুমাত্রিক জ্যোতির্ময়* ১৯৯৭ *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রধান কবিতা।* ২০০৩-এ তাঁর ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না ও আব্বুকে মনে পড়ে জাপানি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে।

প্রচ্ছদ : শিবু কুমার শীল

প্রকৃতিতে জলপাই রঙ মেদুর, স্নিগ্ধতার প্রতীক। এখন ওই প্রতীকটির ওপরও হানা দিয়েছে সামরিকেরা। জীবনের ওপর তো হানা দিয়েছেই, স্বপ্নকে আক্রমণ করেছে; পৃথিবী জুড়ে মানুষের বাস্তব ও স্বপ্ন এখন বুটের নিচে পিষ্ট। আমাদের দুর্গতির বড়ো কারণ সামরিক শাসন। সামরিক শাসন জাতির বাস্তবতাকে পঙ্গু করে, স্বপ্নকে বিকলাঙ্গ করে, সৃষ্টিশীলতাকে হত্যা করে। হুমায়ুন আজাদ, তাঁর সময়ের একমাত্র অকপট লেখক– এ-গ্রন্থটির প্রত্যেকটি প্রবন্ধে রেখেছেন সামরিকতার বিরুদ্ধে তাঁর আপসহীনতার স্বাক্ষর।

ISBN 978 984 04 1273 0

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুমায়ুন আজাদ
জলপাই রঙের অন্ধকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুমায়ুন আজাদ

জলপাই রঙের অন্ধকার

আগামী প্রকাশনী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় মুদ্রণ শ্রাবণ ১৪১৯ আগস্ট ২০১২

আগামী প্রকাশনী কর্তৃক প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৪১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১০
প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩৯৯ এপ্রিল ১৯৯২

স্বত্ব মৌলি আজাদ, স্মিতা আজাদ ও অনন্য আজাদ

প্রকাশক ওসমান গনি আগামী প্রকাশনী ৩৬ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০ ফোন ৭১১-১৩৩২, ৭১১-০০২১

প্রচ্ছদ শিবু কুমার শীল

মুদ্রণ স্বরবর্ণ প্রিন্টার্স ১৮/২৬/৪ শুকলাল দাস লেন ঢাকা

মূল্য : ১৫০.০০ টাকা

ISBN 978 984 04 1273 0

Jalpai Ranger Andhakar :
A Book of Eassy by Humayun Azad.

Published by Osman Gani of Agamee Prakashani
36 Bangla Bazar, Dhaka-1100, Bangladesh.
Phone : 711-1332, 711-0021
e-mail : info@agameeprakashani-bd.com

Fourth print : August 2012

Price : Tk. 150.00 only.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

সানিয়া গফুর [উপমা]
সেগুফতা আহসান [সুচনা]
মৌলি আজাদ [মৌলি]
তোমরা, আমার মতোই, বেড়েছো জলপাই রঙের অন্ধকারের মধ্যে
তোমাদের ভবিষ্যতেরা যেনো বাড়ে আলোর মধ্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূমিকা

সাপ্তাহিক খবরের কাগজ-এ প্রকাশিত *নিবিড় নীলিমার* একগুচ্ছ প্রবন্ধ সংকলিত হলো *জলপাই রঙের অন্ধকার*-এ, তবে নামপ্রবন্ধটি কোথাও বেরোয় নি। ওই অমানবিকতা খাকি থেকে রঙ বদলিয়ে জলপাই রঙের হয়ে উঠেছে, কিন্তু তার স্বভাব হয়েছে আরো নৃশংস। এ-রঙবদল একটি স্নিগ্ধ প্রতীককেও নষ্ট করেছে; —জলপাই পল্লব বোঝাতো শান্তি সুখ সমৃদ্ধি, এখন ওই প্রতীকটির ওপরও হানা দিয়েছে সামরিকেরা। জীবনের ওপর তো হানা দিয়েছেই, স্বপ্নকে আক্রমণ করেছে; পৃথিবী জুড়ে মানুষের বাস্তব ও স্বপ্ন এখন বুটের নিচে পিষ্ট। আমাদের দুর্গতির বড়ো কারণ সামরিক শাসন। সামরিক শাসন জাতির বাস্তবতাকে পঙ্গু করে, স্বপ্নকে বিকলাঙ্গ করে, সৃষ্টিশীলতাকে হত্যা করে। আমি এ-প্রবন্ধগুচ্ছে আমাদের সময় ও সমাজের রূপটি তুলে ধরেছি, এর রূপ দেখে আমি নিজেই ভয় পাই। এর থেকে বাঁচার উপায় হচ্ছে এ-রূপটিকেই ভেঙে ফেলা; তাই প্রচুর ভাঙার কাজও সম্পন্ন হয়েছে প্রবন্ধগুলোতে।

১৪ই ফুলার রোড ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকা — **হুমায়ুন আজাদ**
২৭ পৌষ ১৩৯৮ : ১১ জানুয়ারি ১৯৯২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচিপত্র

জলপাই রঙের অন্ধকার ১১ রাজাকারদের সময় ১৪ নষ্টদের কবলে দুই কবি ১৭
বস্ত্রবালিকারা ২০ বাঙালির ভবিষ্যৎ ২৩ রঙিন আবর্জনা ২৬ ইচ্ছে হয় শিশু হয়ে যাই ২৯
মুমূর্ষু প্রজন্ম ৩২ হরতালের অর্থনীতি ও বিকল্প ভাষা ৩৫ বিতর্কিত ও অবিতর্কিত ৩৮
দাম্ভের দোজখ? ৪১ মানুষেরা ৪৪ এক সপ্তাহ ৪৭ জাতীয় ভাষা একাডেমি ৫০
সাহিত্য পত্রিকাহীন সাহিত্য ৫৩ বইয়ের দোকানে ৫৬ শিশুরা কি পড়বে না? ৫৯
যদি তুমি বাঙলায় জন্ম নিয়ে থাকো ৬২ খোলা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ বিশ্ববিদ্যালয় ৬৫
একুশে ও সাহিত্য ৬৮ ধ্বংস ও সৃষ্টি ৭১ প্রেম ৭৪ আমলাতন্ত্র কি এক ধরনের পশুতন্ত্র? ৭৭
উপাচার্যগণ, তাঁদের সংস্কৃতি ও পরিণতি ৮০ প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয়
৮৩ জনগণের মদ্য ৮৬ বাঙালির মগজ, বাঙলা ভাষা ও পরীক্ষা খাতা ৮৯
বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা ৯৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জলপাই রঙের অন্ধকার

আগে ওই অন্ধকারের রঙটা অন্য রকম ছিলো; খাকি ছিলো, এবং অনেক বেশি কর্কশ দেখাতো; এখন রঙের বদল ঘটেছে, বেশ স্নিগ্ধ দেখায়, কিন্তু ভেতরে তা হয়ে উঠেছে অনেক বেশি হিংস্র। আমরা যাঁরা বেড়েছি ও বছরের পর বছর, দশকের পর দশক বাস করেছি সামরিক অপশাসনের মধ্যে, তারা জানি কতো নৃশংস অমানবিক ওই অন্ধকার। সামরিক শাসন অন্ধকারই, অন্ধকারের থেকেও অনেক খারাপ; তা মানবিক সমস্ত রঙ শোষণ ক'রে নষ্ট করে সব কিছু। গত তিন দশকে পৃথিবী জুড়ে প্রবলভাবে দেখা দিয়েছে সামরিক একনায়কেরা; তারা কেড়ে নিয়েছে মানুষের সমস্ত অধিকার, বিকাশ ঘটতে দেয়নি তাদের, চারদিকে ছড়িয়ে দিয়েছে মধ্যযুগ, এবং প্রতিটি দেশকে পরিণত করেছে আর্থনীতিক ধ্বংসস্তূপে। আমি ছেলেবেলায়ই দেখেছিলাম এক সামরিক একনায়কের আবির্ভাব; সে চারদিকে সাড়া জাগিয়ে এসেছিলো, প্রচারযন্ত্রকে মুখর ক'রে তুলেছিলো তার বন্দনায়, এমন ধারণা তৈরি করেছিলো যে সে দেখা দিয়েছে ত্রাণকর্তারূপে। সামরিক একনায়কেরা প্রথমে ত্রাণকর্তার ভাবমূর্তি নিয়েই দেখা দেয়, রাজনীতি ও রাজনীতিকদের নিন্দিত ক'রে তারা একনায়কত্বের মহিমা প্রচার করে, কিন্তু তারা ত্রাতা নয়, জাতির ধ্বংসকারী। পাকিস্তানটিকে ধ্বংস করেছে সামরিক একনায়কেরা, এখনো করছে, ভবিষ্যতে আরো করবে; সামরিক শাসকেরা কিছু সৃষ্টি করে না, তারা ধ্বংস করে। পাকিস্তানিরূপে আমরা সামরিক একনায়কত্ব দেখেছি, বাঙলাদেশিরূপে দেখেছি; আমাদের যে-দুর্গতি, তার প্রায় সবটাই সামরিক শাসনের ফল। আমাদের সব কিছু যে ব্যর্থ হয়ে গেছে, আমরা যে ধারাবাহিকভাবে পতনের দিকে এগিয়ে চলছি, তার কারণ সামরিক অপশাসন। রাজনীতিকদের দোষের শেষ নেই; গরিব অঞ্চলগুলোতে রাজনীতিকেরা অসৎ হয়ে থাকে, তারা দেশের কথা না ভেবে ভাবে নিজেদের কথা; কিন্তু তারাও অনেক উৎকৃষ্ট সামরিক শাসকচক্রের থেকে।

সামরিক শাসন হচ্ছে দেশের সাথে চরম বিশ্বাসঘাতকতা। তাদের ভার দেয়া হয়েছিলো দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার, তারা তার শপথও করেছিলো; কিন্তু প্রতিজ্ঞা পালন করেনি। বিশ্বাসঘাতকতা করেছে শপথের সাথে। সামরিক বাহিনী একটি প্রথা; সব দেশেই সামরিক বাহিনী রয়েছে, যদিও সব দেশের জন্যে সামরিক বাহিনী জরুরি নয়। কোথাও সামরিক বাহিনী না থাকলেই ভালো হতো, ভবিষ্যতে একদিন মানুষ হয়তো এ-বাহিনীর দরকার বোধ করবে না; কিন্তু এখন রয়েছে অনেকটা প্রথারূপেই। খুব কম দেশের সামরিক বাহিনীর পক্ষেই স্বদেশ রক্ষা করা কঠিন, কিন্তু প্রতিটি দেশের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামরিক বাহিনীই ইচ্ছে করলে দখল করে ফেলতে পারে নিজের দেশ। গত চার দশকে তৃতীয় বিশ্বের বহু দেশের সামরিক বাহিনী নিজের দেশ দখল করেছে, কিন্তু পরাজিত হয়েছে শত্রুর কাছে। যুদ্ধের কৌশলের ব্যাপারেও উন্নত দেশগুলো সেনানায়কদের সিদ্ধান্ত নিতে দেয় না, সিদ্ধান্ত নেয় রাষ্ট্রব্যবস্থাপকেরা। তারা মনে করে যুদ্ধের মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার শুধু সেনাপতিদের ওপর ছেড়ে দেয়া যায় না। যুদ্ধই যাদের ব্যাপার, তাদের ওপর যদি যুদ্ধও ছেড়ে দেয়া না যায়, তাহলে তার চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারগুলো—রাষ্ট্র, সমাজ, সভ্যতা প্রভৃতি তো তাদের ওপর ছাড়ার কল্পনাও যায় না। তাদের শিক্ষা দেয়া হয় বিশেষভাবে, বিশেষ কাজের জন্যে উপযুক্ত করে তোলা হয় তাদের; তাই তারা যখন অন্য কাজে হাত দেয়, তখন তা সম্পূর্ণরূপে পণ্ড করে। সামরিক বাহিনী বদ্ধ বাহিনী, ওই বাহিনীর স্বপ্নকল্পনাও বদ্ধ; তাদের পক্ষে মুক্ত সভ্যতা ও সমাজ, রাষ্ট্র পরিচালনা করা অসম্ভব। তারা শেখে আদেশ মানতে ও আদেশ দিতে, তারা জানে ওপরের আদেশ মানতেই হবে, তারা জানে সমস্ত সমস্যার সমাধান জানে ওপরের ব্যক্তিটি। তারা জানে আমি কিছু জানি না, জানে আমার সেনাপতি; আমার কাজ শুধু তার আদেশ মানা। এ-শিক্ষা মুক্ত সমাজের শিক্ষা নয়; এ-শিক্ষা মুক্ত সমাজের ওপর প্রয়োগ করতে গেলে অনিবার্য হয়ে ওঠে বিপর্যয়। সামরিক বাহিনীতে যে-নিয়ন্ত্রণ, তাতে মানুষ হয়ে ওঠে নিয়ন্ত্রিত প্রাণী, তাদের চোখে ব্যক্তির স্বাধীনতা অত্যন্ত আপত্তিকর। তাই তারা যখন কোনো রাষ্ট্র দখল করে, তখন কেড়ে নেয় মানুষের সমস্ত অধিকার; অন্যের অধিকার স্বীকার করে তাদের পক্ষে আত্মরক্ষা অসম্ভব।

সামরিক চক্র স্বভাবেই প্রতিক্রিয়াশীল; তারা অগ্রগতিতে বিশ্বাস করে না, বিশ্বাস করে স্থির হয়ে থাকতে, চায় পেছনের দিকে যেতে। কেননা যতো পেছনে যাওয়া যায়, ততোই কেড়ে নেয়া যায় মানুষের অধিকার; সামনের দিকে এগোনোর অর্থ হচ্ছে নিজের অধিকার কমা, অন্যের অধিকার বাড়া। তাই সামরিক চক্র বাস করে মধ্যযুগেই; তারা সব ধরনের হাতিয়ার ব্যবহার করে জনগণকে পর্যুদস্ত করার জন্যে। সামরিক শাসনে নষ্ট হয় রাজনীতি, সমাজ রাষ্ট্র, সভ্যতা, অর্থনীতি; কিন্তু সবচেয়ে বেশি নষ্ট হয় মানুষ ও তার মস্তিষ্ক। মানুষের লক্ষণ সৃষ্টিশীলতা, নব নব উদ্ভাবন, কিন্তু তা-ই নিষিদ্ধ হয়ে যায় সামরিক অপশাসনে। মানুষের উদ্ভাসিত যন্ত্রগুলো খুবই আকর্ষণীয়, কিন্তু আসলে সবচেয়ে আকর্ষণীয় উদ্ভাবন হচ্ছে অভিনব চিন্তা। সৃষ্টিশীল মানুষের মস্তিষ্ক শুধু একই রকম কুচকাওয়াজ, একই রকম অভিবাদনে তৃপ্ত থাকতে পারে না। মানুষের মগজ চায় নতুন চিন্তার জন্ম দিতে। কিন্তু সামরিক শাসন তার বিরুদ্ধে; কেননা তার বিশ্বাস হচ্ছে চিন্তার কোনো দরকার নেই, সব বিষয়ে সেনাপতি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, এখন বাকি শুধু সেগুলো প্রয়োগ করা। তবে জনগণ সেনাপতির অধীনস্থ বাহিনী নয় যে সেনাপতির নির্দেশ মেনে নেবে অভিবাদনের সাথে। কোনো সামরিক শাসনই যে সফল হয় নি, তার কারণ তার মধ্যেই নেই সাফল্যের বীজ।

বাঙলাদেশে একাধিক সামরিক অপশাসনের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে; এবং তার মারাত্মক কুফল পড়েছে সারা জাতির বাস্তব জীবন ও চেতনার ওপর। বাঙলাদেশের রাজনীতিক বিকাশ খুবই বিকৃত হয়ে গেছে, রাজনীতিকেরা নষ্ট হয়ে গেছে, গণতন্ত্র এখানে পরিণত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছে একটি নিরর্থক শব্দে, অর্থনীতি উদ্ধারহীন অবস্থায় পৌঁছেছে, সমাজের উচ্চ শ্রেণীটি সম্পূর্ণ নৈতিকতা হারিয়ে ফেলছে, এবং জাতির সৃষ্টিশীলতা পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছে। রাজনীতিকেরা রাজনীতি রেখে মন দিয়েছে দালালিতে, তারা মনে করেছে রাজনীতিতে সাফল্য আসবে না, সাফল্য আসবে সামরিক চক্রের দালাল হ'লে। তারা সফল হয়েছে, কিন্তু ব্যর্থ হয়ে গেছে দেশের রাজনীতি। হাজার হাজার কোটি টাকা বাঙলাদেশ ঋণ হিসেবে পেয়েছে, কিন্তু তাতে দেশের সাধারণ মানুষের কোনো উপকার হয়নি; ওই টাকা লুট করেছে সামরিক চক্র ও তাদের আজ্ঞাবহ দালালেরা। বাঙলাদেশের উচ্চবিত্ত শ্রেণীটি এতো যে অনৈতিক হয়েছে, তার কারণ সামরিক শাসন : তারা দেখেছে সামরিক চক্রের দালাল হ'লে বিনাশ্রমে কোটিপতি হওয়া যায়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ধনী থাকবে, তারা শোষণও করবে; কিন্তু তারা ধন সৃষ্টির জন্যে সাধনা করবে। কিন্তু বাঙলাদেশে কোনো সাধনার দরকার পড়ে নি, দালালি ক'রেই হওয়া গেছে কোটিপতি। ধনসৃষ্টিও এক ধরনের সৃষ্টিশীলতা, যা দেখা যায় উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোতে; কিন্তু বাঙলাদেশে ধন সৃষ্টি করা হয় নি। লুট করা হয়েছে। সামরিক অপশাসনের সময় খুব লাভবান হয় আমলারা, বাঙলাদেশের আমলারাও লাভবান হয়েছে। তারা শুধু দলে দলে মন্ত্রী হয় নি, ধনপতি হয়েছে; এবং জনগণের ওপর করতে পেরেছে প্রচণ্ড আমলাবৃত্তি। বাঙলাদেশের মননগত সৃষ্টিশীলতা শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে সামরিক শাসনের ফলে। এখানে কোনো বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী যে দেখা দেয় নি, তাই নয়; সাহিত্য নিয়ে আমাদের যে কিছুটা গৌরব ছিলো, তাও নষ্ট হয়েছে। বিশ্ববদ্যালয়গুলো এখন কোনো জ্ঞান বিতরণ করার সুযোগ পায় না, সৃষ্টির সুযোগ তো কখনোই পায় নি। অর্থাৎ আমাদের সব কিছু ঠেকে গেছে জলপাই রঙের অন্ধকারে। এক দর্শকের সামরিক শাসন একটি জাতিকে এক হাজার বছর পিছিয়ে দিতে পারে, দেড় দশকের সামরিক শাসনে বাঙলাদেশ কতোটা পিছিয়েছে তা পরিমাপ করাও কঠিন। জাতিকে মুক্ত করা দরকার ওই অন্ধকার থেকে, ওই অন্ধকারের সব রকম ছোঁয়া থেকে, নইলে দেশের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। জলপাই রঙের অন্ধকারের মধ্যে নষ্ট হয় সব কিছু; স্বাধীনতা, দেশ, সমাজ, রাষ্ট্র, সৃষ্টিশীলতা, সভ্যতা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজাকারদের সময়

একাত্তর ছিলো মুক্তিযোদ্ধাদের সময়; আর এটা রাজাকারদের সময়। মাত্র একটি বছর ছিলো মুক্তিযোদ্ধাদের; পুরো দেড়টি দশক দখল ক'রে আছে রাজকাররা। একাত্তরে রাজাকার ছিলো, খুব ভয়ে ভয়ে ছিলো; কারণ সে-সময়টা ছিলো মুক্তিযোদ্ধাদের। একাত্তরে এতো রাজাকার ছিলো না। এখন এতো রাজাকার; কেননা মুক্তিযোদ্ধারা নেই। যারা আছে, তারা ভয়ে ভয়ে আছে। এটা রাজাকারদের কাল; তাই তারা ভয় পায় না ভয় দেখায়। রাজাকার, আর মুক্তিযোদ্ধা শুধু ব্যক্তি নয়; তারা দুটি বিপরীত আদর্শ। প্রগতি, মুক্তি, স্বাধীনতা, কল্যাণের নাম মুক্তিযোদ্ধা; প্রতিক্রিয়াশীলতা, অধীনতা, মধ্যযুগীয়তা, বর্বরতা, মনুষ্যত্বশূন্যতার নাম রাজাকার। রাজাকার হওয়া সহজ, কঠিন মুক্তিযোদ্ধা হওয়া। মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিলে কেউ মুক্তিযোদ্ধা হয় না; মুক্তিযোদ্ধা হওয়ার জন্যে অপরিহার্য প্রগতি, মুক্তি, স্বাধীনতা, কল্যাণে অটল আপোষহীন বিশ্বাস। একবার রাজাকার মানে চিরকাল রাজাকার; কিন্তু একবার মুক্তিযোদ্ধা মানেই চিরকাল মুক্তিযোদ্ধা নয়।

যে-মুক্তিযোদ্ধা বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে আদর্শে, সে আর মুক্তিযোদ্ধা থাকে না, হয়ে ওঠে রাজাকার। বাঙলাদেশে হয়েছে তাই।

রাজাকারেরা এখন অধিকার ক'রে আছে সবকিছু। একাত্তরে প্রতিক্রিয়াশীলতা ছিলো না, মধ্যযুগে ফেরার ইচ্ছে ছিলো না; স্বাধীনতার যুদ্ধ ছিলো প্রতিক্রিয়াশীলতা ও মধ্যযুগের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ। এখন যেখানে যাই, যে-দিকে তাকাই, দেখি ক'সে আছে রাজাকাররা। রাজনীতি দখল ক'রে আছে তারা, কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয় তাদের দখলে, বিচিত্র ধরনের সংঘ এখন তাদের অধিকারে। পত্রপত্রিকার একটি বড়ো অংশ তারা দখল করেছে, এমনকি সাহিত্যেও রাজাকাররা এখন সক্রিয়। বাঙলার বস্তুজগত তাদের অধিকারে চ'লে গেছে, এখন জ্ঞান ও সৃষ্টিশীলতার এলাকাটিও দখল ক'রে সেখানে প্রতিক্রিয়াশীলতা স্থায়ী করতে চায় তারা। কিছু কিছু পত্রপত্রিকা ও বইপত্র পড়লেই বুঝি ওগুলো রাজাকারের ছুরিতে লেখা। ওসব লেখায় ভরা থাকে মধ্যযুগীয় বিষ, মনুষ্যত্ব বিরোধিতা. প্রগতিহনন ও অন্ধকার যুগের পরিকল্পনা। বহু মুক্তিযোদ্ধা দেড় দশকে দীক্ষা নিয়েছে রাজাকারদের কাছে। রাজাকাররা এখন স্থির করে রাষ্ট্রের কাঠামো, দূষিত করে সংবিধান, তৈরি করে সংস্কৃতির কাঠামো, এমন কি মুক্তিযুদ্ধের মূলবাণীও ব্যাখ্যা করে তারা। একাত্তরে এমন ছিলো না। রাজাকারদের দখলে ছিলো কয়েকটি ভবন, রাস্তা ও এলাকা ও কয়েকটি পত্রিকা। এর বেশি কিছু তারা দখল করতে পারেনি। এখন তারা দখল করেছে সব। বাস্তব জগতটি তারা দখল করেছে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এটা খুবই মারাত্মক; তবে এর চেয়েও ভয়াবহ হচ্ছে তারা অবাস্তব জগতটি; — আমাদের স্বপ্ন, কামনা, সৃষ্টিশীলতা ও মননশীলতার এলাকাটিও দখল করতে যাচ্ছে। বাঙলাদেশের বাস্তবতা ও স্বপ্নলোক জুড়ে সারাক্ষণ কাজ করে চলছে রাজাকাররা। মুক্তিযোদ্ধাদের দেখা নেই। এ-দুঃসময়ে চিৎকার ক'রে উঠতে ইচ্ছে করে : চারপাশে রাজাকার, মুক্তিযোদ্ধারা তোমরা কোথায়?

মুক্তিযোদ্ধারা যা কিছু অর্জন করেছিলো, তার সব কিছুই বর্জন করেছে রাজাকাররা। গণতন্ত্র সংশোধিত হয়েছে। সমাজতন্ত্র বাতিল হয়েছে পুরোপুরি; কারণ তা রাজাকারতন্ত্রের প্রধান শত্রু। রাজাকার মানুষে মানুষে সাম্যের কথা ভাবতে পারে না, ভাবতে পারে না ধনসাম্যের কথা। রাজাকার বৈষম্য চায়, নিজে চায় সম্পদ অন্যকে প্রতারণা ক'রে। ধর্মনিরপেক্ষতা রাজাকারের আরেক বড়ো শত্রু। কারণ ধর্মনিরপেক্ষতা মানবিক। রাজাকার প্রকৃত ধর্মও চায় না, চায় ধর্মান্ধতা; চায় ধর্মের নামে শোষণপীড়ন। রাজাকার সব রকমের স্বাধীনতার বিরোধী। রাজাকার বিরোধী ব্যক্তি, শ্রেণী, নারী, বাকস্বাধীনতার। রাজাকার ধর্মের অতীন্দ্রিয় আবেগে আলোড়িত হয় না; তার প্রিয় ধর্মের প্রথা, কারণ প্রথা দিয়ে সে অন্যকে পীড়ন করতে পারে। রাজাকার যুক্তির বিরোধী, নতুন সৃষ্টির বিরোধী। এখন রাজাকারদের কাল; বাঙলাদেশের ইতিহাসে এখন চলছে রাজাকারপর্ব। শহরের কোণায় কোণায় এখন প্রগতিবিরোধিতা। পত্রপত্রিকার পাতায় পাতায় এখন রাজাকারের জিব থেকে ছড়ানো বিষ। এখন প্রগতির কথা বলা কঠিন, প্রথার বিরুদ্ধে কথা বলা অসম্ভব, সত্য উচ্চারণ আত্মহত্যার সমান; কিন্তু এখন চারপাশে উচ্চকণ্ঠে উচ্চারিত হয় অসংখ্য অশ্লীল কথা। মনুষ্যবিরোধিতা ছাপা হয় এখন পত্রিকার পাতা জুড়ে, প্রগতির বিরুদ্ধে অশ্লীল গালাগাল প্রতিদিন মুদ্রিত হয়, বিজ্ঞানবিরোধিতা টেলিভিশন থেকে পাড়ার মাইক্রোফোনে প্রচারিত হয় বেলায় বেলায়। রাজাকার ও রাজাকারবাদ দ্বারা পুরোপুরি পর্যুদস্ত আশির দশক।

এ-সময়ে মুক্তিযোদ্ধাদের ফিরে আসা দরকার। প্রগতিশীল রাজনীতিই পারে তাদের ফিরিয়ে আনতে। একাত্তরের মুক্তিযোদ্ধাদের তো ফিরতেই হবে; এর সাথে আসতে হবে নতুন কালের মুক্তিযোদ্ধাদের, যারা বিশ্বাস করে স্বাধীনতা, সমাজতন্ত্র গণতন্ত্র, ইহজাগতিকতা, প্রগতিশীলতায়। বিশ্বাসের জন্যে বিশেষ জলবায়ু দরকার। রাজাকারি জলবায়ুতে কিশোর-তরুণেরা হয়ে উঠবে রাজাকার; তার চারপাশে যা শুনবে, পড়বে দেখবে তাই হয়ে উঠবে। দূষিত জলবায়ু থেকে দূষিত খাদ্য সংগ্রহ ক'রে হয়ে উঠবে তারা দূষিত মধ্যযুগীয় মানুষ। তাই তাদের জন্যে প্রগতিশীল পরিবেশ তৈরি করা দরকার, যাতে নিঃশ্বাসে তারা যা গ্রহণ করে, তাই তাদের ক'রে তোলে প্রগতিশীল। তাদের জন্য প্রগতিশীল জলবায়ু সৃষ্টি করা খুব জরুরি ও বেশ কঠিন। নতুন প্রজন্মের কাছে অবিরাম প্রগতিশীলতা পৌঁছে দেয়া সহজ নয়। আমরা এমন কোনো সংঘ তৈরি করতে পারি নি, যা ওই দায়িত্ব পালন করবে। তবে প্রতিক্রিয়াশীল রাজাকারি পরিবেশ তাদের ভেতরে ঢুকছে প্রতিদিন। পাঠ্যপুস্তকে তারা পড়ছে প্রতিক্রিয়াশীল অপপাঠ; পত্রপত্রিকায় পড়ছে দূষিত প্রবন্ধ-সম্পাদকীয়-উপসম্পাদকীয়;

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেতার-টেলিভিশনে শুনছে অশ্লীল প্রতিক্রিয়াশীল বাণী। রাজাকারদের গলার স্বর পৌঁছে যাচ্ছে দেশের দূরতম প্রান্তের কিশোরটির কানে; রাজাকারদের জীবাণুগ্রস্ত বাক্য প্রগতিবিরোধী পত্রপত্রিকা ভর ক'রে উপস্থিত হচ্ছে টেবিলে। তারা আক্রান্ত হয়ে আছে প্রতিক্রিয়াশীল রাজাকারি জলবায়ু দিয়ে। তাই নতুন প্রজন্মকে উদ্ধার করতে হবে এ-অবস্থা থেকে। যদি তাদের উদ্ধার করা যায়, তবে দেখা দেবে মুক্তিযোদ্ধা ও প্রগতিশীলতা; নইলে রাজাকারের অপআদর্শ দিয়ে পর্যুদস্ত হবে বাঙলাদেশ। আমাদের বর্তমান রাজাকারদের দখলে; ভবিষ্যৎও কি থাকবে রাজাকারদের দখলে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নষ্টদের কবলে দুই কবি

আমাদের যা-কিছু ভালো, তার সবটাই প্রায় নষ্টদের অধিকারে চ'লে গেছে; এখনো যে-দু-এক ফোঁটা ভালো প'ড়ে আছে অগোচরে, তাও শিগগিরই তাদের কবলে পড়বে, নষ্ট হবে। রাষ্ট্রযন্ত্র অনেক আগেই নষ্টদের কবলে পড়েছে; ধর্ম তাদের কবলে, সংস্কৃতিও তাদের কবলে। সৌন্দর্য, মেধা, প্রতিভাও তাদের কবলে; এমন কি অমরতাও এখন পুরোপুরি তাদের কবলে। কবিতার জন্যে নষ্টদের লোভ থাকার কথা ছিলো না; কিন্তু সেটাকে তারা বাদ দেয় নি; তাকেও কয়েক দশকে নষ্ট করেছে। একজন কবি অনেক আগেই চলে গিয়েছিলেন নষ্টদের কবলে; —তিনি নজরুল ইসলাম, মুসলমানদের রবীন্দ্রনাথ। তিনি বিখ্যাত বিদ্রোহী কবিরূপে, কিন্তু তাঁকে শোচনীয়ভাবে ব্যবহার করেছে প্রতিক্রিয়াশীলেরা; এমনভাবে তাঁকে ব্যবহার করেছে প্রতিক্রিয়াশীলেরা যে মনে হতে পারে নজরুল তাদেরই কবি। পাকিস্তানি নষ্টরা তাঁকে ব্যবহার করেছে; তাঁকে এক বিশেষ সম্প্রদায়ের ও ধর্মের কবিতে পরিণত করেছে। বাকি ছিলেন আরেকজন— রবীন্দ্রনাথ, যাঁকে বাতিলের চেষ্টা করে আসছে নষ্টরা পবিত্র পাকিস্তানের কাল থেকে; পেরে ওঠেনি। এমনই প্রতিভা ওই কবির, তাঁকে বেতার থেকে বাদ দিলে তিনি জাতির হৃদয় জুড়ে বাজেন; তাঁকে পাঠ্যপুস্তক থেকে বাদ দিলে দিনি জাতির হৃদয়ের কাব্যগ্রন্থে মুদ্রিত হয়ে যান; তাঁকে বঙ্গভবন থেকে বাদ দেয়া হলে তিনি সমগ্র বঙ্গদেশ দখল করেন; তাঁর একটি সঙ্গীত নিষিদ্ধ হ'লে তিনি জাতীয় সঙ্গীত হয়ে ওঠেন।

প্রতিক্রিয়াশীল নষ্টরা অনেক লড়াই করেছে তাঁর সাথে, পেরে ওঠে নি; তাঁকে মাটি থেকে বহিষ্কার করা হ'লে তিনি আকাশ হয়ে ওঠেন; জীবন থেকে তাঁকে নির্বাসিত করা হ'লে তিনি রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন জাতির স্বপ্নলোকে। নষ্টরা তাঁকে মুছে ফেলার চেষ্টা করেছে আপ্রাণ। যদিও তিনি জাতীয় সঙ্গীতের রচয়িতা, তবুও তিনি জাতীয় কবি নন; তাঁর নামে ঢাকায় একটি রাস্তাও নেই; সংস্থা তো নেইই। তাতে কিছু যায় আসে নি তাঁর; দশকে দশকে বহু একনায়ক মিশে যাবে মাটিতে, তিনি বেঁচে থাকবেন বাঙলায় ও বিশ্বে। ওই মহান কবির সাথে লড়াইয়ে না পেরে জয়ের বিপরীত পথ বের করেছে নষ্টরা। এবার তারা তাঁকে দখল করেছে, নিজেদের কবলে নিয়ে এসেছে। তারা বুঝতে পেরেছে রবীন্দ্রনাথকে নষ্ট করার শ্রেষ্ঠ উপায় তাঁকে কবলে নিয়ে আসা, তাঁকে সরকারি ক'রে তোলা; তাঁকে কবিতাকেন্দ্র নামের দুষ্ট সংঘের একটি সদস্যে পরিণত করা। ভালো জিনিসের অপব্যবহার ক'রে মানুষের যতোটা ক্ষতি করা সম্ভব, ক্ষতিকর বস্তু দিয়েও ততোটা ক্ষতি করা সম্ভব নয়। এটা তারা বুঝেছে, তাই তারা অধিকার করেছে রবীন্দ্রনাথকে; — তারা এখন নিজেদের মতো একটি রবীন্দ্রনাথ তৈরি করতে পারবে, যেমন তারা অনেক দিন ধ'রেই তৈরি করছে নিজেদের নজরুল। তারা যদিও পুরোপুরি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্রবিরোধী; তাদের সভাপতি পাকিস্তানের শুরুতেই পাকিস্তানের কল্যাণের জন্যে রবীন্দ্রনাথকে প্রত্যাখ্যানের প্রস্তাব দিয়েছিলো, তবু তারা শিলাইদহে দখল করেছে রবীন্দ্রনাথকে। পীড়ন করেছে কবির আত্মাকে, দূষিত করেছে বাঙলায় শুদ্ধতম সৌন্দর্যকে। তারা রবীন্দ্রনাথকে এখন থেকে দীক্ষা দেবে রাষ্ট্রধর্মে, তাঁকে ক'রে তুলবে সাম্প্রদায়িক; তারা দেখাবে রবীন্দ্রনাথ একনায়কত্বের অনুরাগী ছিলেন, দেখাবে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাসী ছিলেন না গণতন্ত্রে; দেখাবে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সমাজতন্ত্রবিরোধী; দেখাবে রবীন্দ্রনাথ ধর্মান্ধ কবি। নষ্টরা কোনো শুদ্ধতাকেই শুদ্ধ থাকতে দেয় না, রবীন্দ্রনাথকেও থাকতে দেবে না; তাঁকেও নষ্ট করবে।

নষ্টরা নজরুলকে যেভাবে নষ্ট করেছে, মুছে দিয়েছে নজরুলের প্রতিভার আসল পরিচয়, তা খুবই মর্মস্পর্শী। পাকিস্তানি সাম্প্রদায়িকেরা খুব পৃষ্ঠপোষকতা করেছে তাঁর; তাঁকে সংশোধন ও সংশোধন ও সংশোধন ক'রে তাঁকে পরিণত করেছিলো এক সাম্প্রদায়িক কবিতে। তারা তাঁর কবিতায় খুঁজে পেয়েছিলো অসংখ্য অবাঞ্ছিত বস্তু, সেগুলো বর্জন করার জন্যে তারা ছিলো উদগ্রীব। বিদ্রোহী নজরুল তাদের প্রিয় ছিলো না, ছিলো শত্রু; তাই তারা খুঁজেছে নজরুলের রচনার এমন সব অংশ, যা দিয়ে তারা ভেঙে ফেলতে পারে নজরুলের বিদ্রোহী ভাবমূর্তিটি। তারা রবীন্দ্র-নজরুল বিরোধিতাও সৃষ্টি করেছে; প্রচার করেছে রবীন্দ্রনাথের থেকে অনেক বড়ো কবি নজরুল। পাকিস্তানি সাম্প্রদায়িকতার ফলে তাতে বিশ্বাসও করেছে অনেকে। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে উঠছে নজরুলব্যবসা। নজরুলসাহিত্যের আলোচকেরা সাহিত্যও ভালো বোঝে না, তাদের অধিকাংশই প্রগতিবিরোধী, অনেকেই রাজাকার;' তবে তারা মেতে উঠেছে নজরুলবিষয়ক নানা নিম্নমানের পুস্তক লিখতে। নজরুলকে নিয়ে এদের লেখা বইপত্র অপাঠ্য, কেননা এগুলো লেখার পেছনে কোনো সাহিত্যবোধ কাজ করে নি, কাজ করেছে স্বার্থবোধ। সরকার যে একটি ইনস্টিটিউট তৈরি করেছে, এ-কারণেই সেটি গবেষণাকেন্দ্রের বদলে হয়েছে মাজার। নষ্টদের কবলে পড়ে নজরুল হারিয়েছেন তাঁর প্রকৃত পরিচয়; তাঁকে ব্যবহার করা হয়েছে প্রগতিবিরোধী কাজে; এবং দেখা দিয়েছে গৃধ্নু একদল নজরুলব্যবসায়ী। তাদের কাজ নজরুলকে বার বার নষ্ট করা, নজরুলের মুখের ওপর সরকারি মুখোশ পরিয়ে দেয়া। নজরুল-অধ্যাপক নামে কিছু পদ সৃষ্টি করা হয়েছে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে; —এও এক প্রতারণা। ওই পদ সৃষ্টিতে কোনো নিয়ম মানা হয়নি, কোনো নতুন পদ সৃষ্টি করা হয় নি; সরকারের অনুগৃহীত কিছু ব্যক্তির গায়ে ছাপ মেরে দেয়া হয়েছে নজরুল অধ্যাপকের। কিন্তু এর কোনো বৈধতা নেই। যে-ভাবে তাঁদের নিয়োগ করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ অবৈধ, ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনবিরোধী। যাঁদের নিয়োগ করা হয়েছে, তাঁরা আপাদমস্তক অযোগ্য। তাই নষ্টদের কবলে প'ড়ে নজরুল জড়িয়ে পড়েছেন অনেক অপরাধের সাথে, নিজের অনিচ্ছায়। এবার রবীন্দ্রনাথ কবলে পড়েছেন নষ্টদের, তাঁর পরিণাম ভেবে ভয় পাচ্ছি। শুরুতেই দেখছি রবীন্দ্রনাথ একদল প্রগতিশীলকে টেনে নিয়েছেন অধঃপতনে; —তারা এতোকাল কষ্টেসৃষ্টে প্রগতির দড়িটার ওপর দাঁড়িয়ে ছিলো; কিন্তু বৈশাখী ঝড়ে লুটিয়ে পড়লো পাতালে। আগামী শ্রাবণের বৃষ্টিতে আরেকদল পা পিছলে পড়বে পাতালে। রবীন্দ্রনাথ তো একা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাবেন না, পাতালে টেনে নেবেন একদল সুবিধাবাদীকে। রবীন্দ্রনাথের জন্যে দুঃখ করি না, মহান তিনি, একদিন তিনি নিজেকে মুক্ত করবেনই নষ্টদের কবল থেকে; শোক বোধ করছি ওই অধঃপতিতদের জন্যে, কেননা তাদের শক্তি এতো সামান্য লোভে এতো অসামান্য যে তারা কোনো দিন উঠে আসতে পারবে না পতনের পঙ্ক থেকে। এরপর থেকে তারা সেবা করে যাবে একনায়কত্বের, নষ্টামোর, প্রগতিবিরোধিতার, স্বার্থের, চরিত্রহীনতার। নষ্টদের কবলে পড়ে প্রথমেই রবীন্দ্রনাথের সুন্দর মুখে লাগবে একরাশ কালি, ওই কালি মাখিয়ে দেবে নষ্টরাই; অনেকের মনেই সন্দেহ জাগবে অশুভ শক্তির প্রতিনিধিরা যাঁর প্রশংসা করে, তিনি কি শুভ, তিনি কি মহৎ; তিনি কি মঙ্গল? অচলায়তনের প্রবক্তারা করছে অচলায়তন-এর রচয়িতার প্রশংসা; তারা ভোঁতা করে ফেলবে রবীন্দ্রনাথকে। তারা বুঝিয়ে দেবে রবীন্দ্রনাথ আসলে অচলায়তনেরই পক্ষপাতী; আমরা এতোদিন ভুল বুঝে এসেছিলাম যে তিনি মুক্তির পক্ষের। তারা বুঝিয়ে দেবে রবীন্দ্রনাথ চেয়েছেন তাসের দেশ; তিনি মানুষ হওয়ার কথা বলেন নি। প্রতিক্রিয়াশীলেরা উঠে প'ড়ে লাগবে এরপর, দেখিয়ে দেবে রবীন্দ্রনাথ তাদেরই লোক। মহান রবীন্দ্রনাথ তাদের কবলে প'ড়ে হয়ে উঠবেন ক্ষুদ্র, মুক্ত রবীন্দ্রনাথ হবেন বন্দি রবীন্দ্রনাথ; মানুষের কবি, মানুষের শত্রুদের কবলে প'ড়ে হয়ে উঠবেন মানুষের শত্রু; প্রতিক্রিয়াশীলতার পৃষ্ঠপোষক; —যেমন কয়েক দশকে হয়ে উঠেছেন নজরুল। বাঙলার দুই কবি এখন নষ্টদের কবলে, এতেই বোঝা যায় বাঙলার অবস্থা এখন কতোটা শোচনীয়!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বস্ত্রবালিকারা

সকালে যখন ওদের দেখি, দেখি ওরা দল বেঁধে ছুটছে। একঝাঁক রোগা, কালচে, বিপন্ন বালিকা সমস্ত যানবাহনের কথা ভুলে কোনো দূর গন্তব্যের উদ্দেশ্যে ছুটে চলেছে, এবং সন্ধ্যার পরে, কখনো রাত নটা, কখনো দশটার দিকে, দেখি ওরা ছুটে ফিরছে। তবে এখন বেশ ক্লান্ত, ফেরার গতিও কম। ওরা বস্ত্রবালিকা। অধিকাংশেরই বয়স বেশ কম, থাকে হয়তো কোনো বস্তিতে; হয়তো শিশুকাল থেকেই ভালো করে খায় নি, হয়তো এক সময় কোনো বাসায় পরিচারিকার কাজ করতো; এখান দেশের পুঁজিবিকাশের জন্যে কাঠখড়লাকড়ির মতো পুড়ছে। চলার সময় ওরা কোনো দিকে তাকায় না; কেউ ওদের দিকে তাকাক, তাও ওরা হয়তো চায় না। লিপস্টিকরাঙা আধুনিকদের থেকেও ওদের আমি অনেক শ্রদ্ধা করি, মনে হয় ওরাই খাঁটি নারীবাদী, যারা সমাজের অনেকগুলো শেকল ছিঁড়ছে। ঘরে না থেকে যে ওরা কোনো কাজের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ছে, এটা এক বড়ো ঘটনা; এবং ওরা যে হেঁটে যায় গন্তব্যের দিকে, পয়সার অভাবেই হাঁটে, তবুও এটা প্রগতিশীলতার দিকে একটি বিশাল পদক্ষেপ। ওরা লিপস্টিকরঞ্জিতদের মতো সারাক্ষণ নিজেদের যৌনসামগ্রী ভাবে না, ভাবে কর্মী। বস্ত্রশিল্প পুঁজির কী বিকাশ ঘটিয়েছে, জানি না; তবে একগোত্র বন্দি, পীড়িত বালিকা, নারীকে মুক্ত করেছে স্যাঁতসেঁতে বস্তি ও সমাজ থেকে। বস্ত্রশিল্পের এ-এলাকাটি দেখা না দিলে এ-বালিকারা না খেয়ে থাকতো, বাসায় ঝিয়ের কাজ করতো, একবার কোনো বুড়োর সাথে আরেকবার কোনো বদমাশের সাথে বিয়ে বসতো, কয়েকটি সন্তান জন্ম দিয়ে এক সময় হয়তো দ্বারে দ্বারে ফিরতো। তখনো হাঁটতো, তবে কোনো গন্তব্য থাকতো না। এখন তারা কাজে যায়; কাজে যাওয়াই এক রকম মুক্তি। যে-বালিকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে কোনো কাজে যায় না, ব্যবহৃত হয় কারো বিনোদন সামগ্রীরূপে ও তাতে ধন্য বোধ করে, তার থেকে ওই নিরক্ষর, বিপন্ন আবেদনহীন বস্ত্রবালিকাটি অনেক প্রগতিশীল ও শ্রদ্ধেয়। তবে পুঁজিবাদ দাতা নয়, শোষক; ওই বালিকাদের কল্যাণে দেশ জুড়ে বস্ত্রকারখানাগুলো খোলা হয়নি, খোলা হয়েছে পুঁজিপতিদের পুঁজি বাড়ানোর উদ্দেশ্যে। বস্ত্রশিল্পের মালিক হয়েছে চতুর ব্যক্তিরা, যারা সরকারি টাকা বাগাতে দক্ষ, যাদের উদ্দেশ্য অল্প সময়ে প্রচুর টাকা উৎপাদন করা। বস্ত্রশিল্প অল্পদিনের মধ্যেই পরিণত হয়েছে এক কেলেংকারিতে। অবসরপ্রাপ্ত সামরিক ও অসামরিক কর্মকর্তারা, শ্রম ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের ঝানু আমলারা, সরকারের অনুগৃহীতরা মালিকরূপে দেখা দিয়েছে বস্ত্রশিল্পের; অনেক সুবিধা আদায় ক'রে নিয়েছে তারা রাষ্ট্রের কাছ থেকে; এবং বেশ ভালো ব্যবসা করছে। উৎপাদন করছে, রপ্তানি করছে, কালোবাজারি করছে, আরো অনেক কিছু করছে, যা অসৎ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুঁজিবিকাশে অপরিহার্য। পুঁজিবিকাশের সাথে সাথে পাপের বিকাশ না ঘ'টে পারে না; তবে বস্ত্রশিল্পে পাপের পরিমাণটা একটু বেশি। আর ওই বস্ত্রবালিকারা, যারা উৎপাদন ক'রে চলছে নানা ধরনের শার্ট, যাদের ঘামের গন্ধলাগা শার্ট পরছে মার্কিন যুবক, তাদের অবস্থা কী? তারা কি ভালো আছে, নতুন পুঁজিপতিরা কি তাদের মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার পারিশ্রমিক দিচ্ছে? নাকি বস্ত্রশিল্প দেশে সৃষ্টি করছে একটি করুণ, শোষিত নব্য দাসীসম্প্রদায়?

টমাস হুড 'শার্টের গান' নামে একটি করুণ কবিতা লিখেছিলেন প্রায় দুশো বছর আগে, যাতে শার্টশেলাইকারী এক বালিকার দুঃখ-দারিদ্র্য-যন্ত্রণা পুঁজিবাদের কলেপড়া প্রাণীর চিৎকার হয়ে বেজেছে। তার আঙুল অবশ ও জীর্ণ হয়ে পড়েছে, ভারী ও লাল হয় উঠেছে চোখের পাতা, তবু সে সুতো গেঁথে চলেছে সুচে, শেলাই ক'রে চলেছে ভোরের মোরগের বাক শোনার সময় থেকে সন্ধ্যার পর আকাশে তারা ফোটা পর্যন্ত। তার জীবনে দুটি শব্দ স্টিচ! স্টিচ! স্টিচ! আর ওঅর্ক! ওঅর্ক! ওঅর্ক! ওঅর্ক! বেজে চলে শেলাইকলের শব্দের মতো। ফিতা পটি, জোড়া; আর জোড়া পটি, ফিতা করতে করতে বোতাম লাগানোর সময় সে ঘুমিয়ে পড়ে এবং স্বপ্নেই সে শেলাই ক'রে ফেলে জামার বোতামগুলো। তবে তার জীবনসাথী ক্ষুধা ও দারিদ্র্য—পুঁজিবাদের অসহায় ক্রীতদাসী সে। বাঙলাদেশের বস্ত্রবালিকারা বয়ে চলেছে তারই উত্তরাধিকার—চৌদ্দ ঘণ্টা খাটতে হয় তাদের, সকাল আটটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত; বেতন অতি তুচ্ছ। শোনা যায় মাসের শেষে তাদের পুরো বেতন দেয়া হয় না, যার বেতন ছশো টাকা তাকে দেয়া হয় চারশো, বাকিটা চিরকালের জন্য বাকি থেকে যায়। অতিরিক্ত কাজের পারিশ্রমিকের আশ্বাস দেয়া হয় তাদের, তবে পারিশ্রমিকটা তারা হাতে পায় না। তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই, অসুখের সময় তারা কোনো পারিশ্রমিক পায় না, চাকুরি ছেড়ে দেয়ার পর তারা তাদের প্রাপ্য অর্থ পায় না। তাদের অভিযোগ করারও কোনো জায়গা নেই। তাই বস্ত্রশিল্প বস্ত্রবালিকাদের পরিণত করেছে বস্ত্রক্রীতদাসীতে, যারা গৃহপরিচারিকাদের থেকেও অসহায়। একটি মেয়ে এক সময় বস্ত্রশিল্পে কাজ করতো, এখন কাজ করে আমাদেরই বাসায়। সে ওই কাজ ছেড়ে দিয়েছে, কারণ যা বেতন সে পেতো তাতে তার একারই চলতো না। বস্ত্রশিল্প শোষণ শিল্পরূপে দেখা দিয়েছে; তা কয়েক লাখ অসহায় বালিকাকে শোষণ ক'রে কিছু লোকের পুঁজি বাড়িয়ে চলছে। আমাদের শোষণমূলক সমাজে পুরুষেরাই শোষিত পথে পথে, তবে পুরুষদের পুরুষত্ব সাধারণত শোষিত হয় না, কিন্তু শোষিত হয় নারীদের নারীত্বও। বস্ত্রবালিকারা মালিকদের যৌনশোষণেরও শিকার হয়ে থাকে। আর্থ ও যৌন শোষণ মিলে বস্ত্রশিল্প অমানবিকরূপ নিয়েছে।

বস্ত্রশিল্প দেশের পুঁজির বিকাশ ঘটাতে গিয়ে বিকাশ ঘটিয়েছে শোষণ ও পীড়নের; বস্ত্রবালিকাদের নারীশ্রমিক হওয়ার গৌরবও দেয় নি, দিয়েছে ক্রীতদাসীর কলঙ্ক। যে-বালিকাটি সকালে ঘুম থেকে ওঠেই প্রায় না খেয়ে ছোটে কারখানার উদ্দেশ্যে, সারাদিন খাটুনির পর ক্লান্ত পায়ে বস্তিতে ফেরে, পয়সার অভাবে যে রিকশার কথা ভাবতে পারে না, সে যদি জীবনে ন্যূনতম নিশ্চয়তাও না পায়, তাহলে সে কেনো ওখানে ছুটবে? তবু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাকে ছুটতেই হবে, সে এমন সমাজে জন্ম নিয়েছে, যেখানে শোষিত বাধ্য হয়ে এগোয় শোষকের দিকে, অসহায় হরিণ এগোয় নেকড়ের দিকে। বস্ত্রশিল্পের জন্যে অবিলম্বে তৈরি করা দরকার মানবিক শ্রম আইন, যা বস্ত্রবালিকাদের সমস্ত স্বার্থ রক্ষা করবে। দেখতে হবে যাতে তারা ঠিক বেতন পায় ঠিক সময়ে, অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্যে যেনো পায় অতিরিক্ত পারিশ্রমিক; যেনো থাকে তাদের উপযুক্ত চিকিৎসা ও যানবাহন ভাতা, যেনো অবসর নেয়ার পর তারা পায় উপযুক্ত ভাতা। এ-বিষয়ে এখনো যে কোনো সুষ্ঠু নীতি প্রণীত হয় নি, এটাই বিস্ময়। প্রণীত না হওয়ার হয়তো কারণ আছে— সরকার সাধারণত অকাজেই ব্যস্ত থাকে, ঠিক কাজটি করার সময় হয় না তার; আর বস্ত্রশিল্পের মালিকেরা শক্তিমান পুরুষবর্গ, তারাই হয়তো প্রতিরোধ ক'রে চলছে কোনো নীতি প্রণয়নের সম্ভাবনাকে। এখন যেভাবে চলছে, সেভাবে চললে বস্ত্রশিল্প একটি জাতীয় কেলেংকারিতে পরিণত হবে; পুঁজিবাদের মুখ রক্ষার জন্যেই তাদের জন্যে সুষ্ঠু শ্রমনীতি অচিরেই প্রণীত হওয়া দরকার। যে-বালিকাটি ভোর হওয়ার সাথে সাথে ছুটছে কারখানা অভিমুখে, চোখ আর আঙুল জীর্ণ করে শেলাই করছে সভ্যতার মুখোশ, তার সাথে সভ্যতা যেনো সভ্য আচরণ ক'রে : তাকে দেয় খাদ্য, বাসস্থান, নিরাপত্তা, তাকে ক্রীতদাসী না ক'রে তাকে যেনো দেয় মানুষের মর্যাদা, যা তার প্রাপ্য সহজাতভাবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঙালির ভবিষ্যৎ

প্রতিটি পতঙ্গেরই সম্ভবত ভবিষ্যৎ রয়েছে, তবে, মনে ভয়ঙ্কর প্রশ্ন জাগে বাঙালির কি রয়েছে ভবিষ্যৎ? মাত্র এগারোটি বছর পর একটি নতুন শতক হাজির হবে পৃথিবী জুড়ে; অনেক জাতি সমারোহে সগৌরবে পা রাখবে নতুন শতকে, কিন্তু বাঙালি কি কোনো গৌরব বোধ করবে ওই শতকে পা রাখতে? অনেক জাতি ওই শতকে হাজির হবে চমৎকার সমাজ ও রাজনীতি নিয়ে; তাদের থাকবে উন্নত বিজ্ঞান, আকর্ষণীয় সাহিত্য, শিল্পকলা, দর্শন। ওই সময়ে বাঙালির কী থাকবে? একটি সুন্দর সমাজ ও রাজনীতি নিয়ে ওই শতকে উপনীত হ'তে পারবে বাঙালি, থাকবে তার কোনো সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, শৈল্পিক গৌরব? তখন হয়তো বাঙালির সংখ্যা দ্বিগুণ হবে : বাঙালির মাথা বাঙালি খাবে। তাদের অধিকাংশেরই থাকবে না খাদ্য ও বাসস্থান। রাজনীতি কি রূপ নেবে তখন? একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র নিয়ে আমরা হাজির হ'তে পারবো একুশ শতকে, নাকি তখনো কাঁধে চেপে থাকবে স্বৈর দৈত্য? সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে ন্যায়, নীতি, শৃঙ্খলা, নাকি বর্তমানের মাৎস্যন্যায় বাড়বে আরো দশগুণ? বিজ্ঞান দেখা দেবে তখন বাঙলাদেশে, নাকি তখনো বাঙলা বিজ্ঞানীরা আদিম বিজ্ঞান শিখতে ব্যস্ত থাকবে? বিকাশ ঘটবে সাহিত্য ও শিল্পকলার? আশির দশকে সাহিত্য ও শিল্পকলা লোপ পেতে বসেছে, এর কি ঘটবে নবজাগরণ? দর্শন নেই, তাই এক দশকে কোনো দর্শনের উদ্ভব ঘটবে ব'লে মনে হয় না। বাঙালি পৃথিবীর সবচেয়ে আশাবাদী জাতি, আশা এখানে খুবই প্রশংসিত সামগ্রী। আমাদের সৃষ্টিশীলতার সমস্ত শাখায় ছুটে চলে আশায় অসংখ্য স্রোত; সমাজনেতারা আশার পুরোহিত, আর রাষ্ট্র যাদের অধিকারে, আশাই তাদের স্রোত; প্রধান পণ্য—বিনামূল্যে তারা আশা বিক্রি ক'রে থাকে। তাই সবাই সম্মিলিত আশা পোষণ করতে পারে যে বাঙালির ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল; তারা সুড়ঙ্গের অপরপ্রান্তে আলোর বন্যা দেখতে পারে, তবে আমার অন্ধ চোখে কোনো শিখা ঢুকছে না। একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন ভবিষ্যৎ আমি দেখতে পাই, যাকে সরল বাঙলায় প্রকাশ করলে দাঁড়ায় যে বাঙালির কোনো ভবিষ্যৎ নেই।

বাঙালির কাঁধের দৈত্যটির কথাই ধরা যাক। কাঁধ থেকে এটি সহজে নেমে যাবে, এমন ভাবার কোনো কারণ নেই, বরং এটি নিশ্চয় এখন স্বপ্ন দেখছে কমপক্ষে আরো এগারো বছর স্কন্ধ আরোহণ সুখ উপভোগের। দেশকল্যাণের যে-কামনা নিয়ে শাসকসম্প্রদায় এসেছে, সে-কামনা আট বছরে তাদের মেটে নি; তারা হয়তো ভাবছে অন্তত বিশ শতকটি তাদের দরকার, তাহলে দেশটিকে তারা চমৎকারভাবে উত্তীর্ণ ক'রে দিতে পারবে একুশ শতকে। কিছু ব্যবস্থা তাদের নিতে হবে এগারো বছর টিকে থাকার জন্যে; এর জন্যে কিছুটা পীড়ন করবে, অনেক আদর করবে, আরো অনেক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দালাল বানাবে; বিরোধী দলগুলো থেকে কুমড়োর ফালির মতো কোনো কোনো অংশ কেটে নিয়ে দেশকে গণতান্ত্রিক ক'রে তুলবে। অনেক বিরোধী বীর হয়ে উঠবে একনায়কের বিশ্বস্ত বান্দা। তাই মনে করতে পারি বাঙালি একুশ শতকে হাজির হবে স্বৈর দৈত্যকে কাঁধে নিয়েই, তখন তার মেরুদণ্ড পুরোপুরি বেঁকে যাবে, গণতন্ত্রের কোনো স্বপ্ন থাকবে না। জয়, জয়, মহানায়ক ধ্বনি তুলে মহাদাস বাঙালি প্রবেশ করবে একুশ শতকে। সমাজের অবস্থা কেমন হবে? বাঙালির সংখ্যা যদি দ্বিগুণ হয়, তখন ওই সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে কেউ থাকবে না। বাঙালির খাদ্য থাকবে না, বাসস্থান থাকবে না, বিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় তখন থাকবে কিনা সন্দেহ। সেদিন পুলিশ বাহিনী পুরোপুরি নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে, বা এখন তারা যাদের দমনের জন্যে নিয়োজিত, যোগ দেবে তাদেরই দলে। দিকে দিকে খুনখারাবি চলতে থাকবে, ধর্ষণ হয়তো হয়ে উঠবে চিত্তবিনোদনের প্রধান পদ্ধতি। কারো ঘরে থাকবে না কোনো ধনসম্পদ। পাড়ার নিয়ন্ত্রকেরা এসে চাইলেই আনন্দের সাথে তাদের হাতে তুলে দিতে হবে টেলিভিশনটি, যদি কন্যাটিকেও চায় তাহলেও উত্তেজিত হওয়া সম্ভব হবে না। রাস্তায় গাড়ি চলার জায়গা থাকবে না হয়তো, কারণ সমস্ত রাস্তাই ব্যবহৃত হবে উদ্বাস্তুদের আবাসিক এলাকারূপে। ওই সমাজে থাকবে কোনো হাসপাতাল? সরকার একুশ শতকের মধ্যে সবার জন্যে স্বাস্থ্য ব'লে যে-স্লোগানটি দিয়ে তৃপ্তি পায়, সেটি সংশোধিত হয়ে যাবে; সবার জন্যে অসুস্থতাই তবে তখন সরকারি স্বাস্থ্যনীতি। স্বাস্থ্যের বদলে অসুস্থতাই হবে বাঙালির জন্যে স্বাভাবিক; সুস্থ মানুষ দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠবে, হয়তো তাদের পাওয়া যাবে দেশের কোনো কোনো সুরক্ষিত এলাকায়। বিদ্যালয়ে তখন কে পড়বে, কে পড়াবে, কারা পড়বে ও পড়াবে বিশ্ববিদ্যালয়ে? পড়াশুনোর কোনে মূল্যই থাকবে কিনা সন্দেহ। মন্ত্রী হওয়ার জন্যে নিরক্ষরতা হয়তো তখন সরকারিনীতি হিসেবে গৃহীত হবে, লেখাপড়ার সাথে যাদের কোনো সম্পর্ক আছে তারা পুরোপুরি বিতাড়িত হবে রাজনীতি ও প্রশাসন থেকে। লেখাপড়া সমাজবিরোধী কাজ ব'লে গণ্য হতে পারে যে-সময়। গুণ্ডামির খুবই বিকাশ ঘটবে, কারণ ওই প্রতিভা ছাড়া কিছুই পাওয়া যাবে না। একুশ শতকে পা দেয়ার সময় হয়তো বাঙলার বিভিন্ন এলাকা থাকবে বিভিন্ন গুণ্ডার অধীনে, তারা রাষ্ট্রের মধ্যে রাষ্ট্র শাসন ক'রে যাবে। ধর্মকর্মের খুবই বিকাশ ঘটবে সে-সময়। ভেতরে পাপ যখন বাড়ে, বাইরে তখন ধর্মের পতাকা খুবই ওড়াউড়ি ক'রে, এবং একুশ শতকে বাঙালি হয়তো ঢুকবে একটি ধর্মরাষ্ট্র মাথায় ক'রে। আশির দশকে দেশের কোণায় কোণায় গজিয়ে উঠছে পীরেরা, আগামী দশকে দেশ ভ'রে যাবে ভণ্ডপীরে দরগা ও খানকায় ছেয়ে যাবে দেশ, হয়তো পীরসভ্যতা নামে একটা নতুন সভ্যতার পত্তন হবে।

বিজ্ঞান কি থাকবে একুশ শতকে পা দেয়ার সময়? বাঙালির বিজ্ঞানচর্চা এখন অনেকটা হাস্যকর, আগামী দশকের শেষ দিকে ওটা বাতিল হয়ে যাবে। বাঙালির পক্ষে, বাঙলাদেশে থেকে, কোনো মৌলিক আবিষ্কারই সম্ভব নয়, এটা সবাই বোঝে, একুশ শতকে প্রবেশের সময় তা বিজ্ঞানীরাও বুঝে ফেলবে। বাঙালির বিজ্ঞানচর্চার আর দরকার পড়বে না। দর্শন? এটা এখানে ছিলো না, এখন নেই, ভবিষ্যতে একেবারেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকবে না। সাহিত্য থাকবে? আশির দশকে সাহিত্য ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, কবিতা হয়ে উঠেছে দালালি ও গালাগালি, আগামীর দশকে দালালি ও গালাগালিই ছোটোবড়ো পঙ্‌ক্তিতে ছাপা হবে। তবে দালালির পরিমাণ বাড়বে, অনেক বিদ্রোহী কবি দালালির মহাকবিতা লিখবে। চিত্রকলা থাকবে? এটা থাকবে খুবই বেশি পরিমাণে, কারণ ছবি ছাড়া আজকাল কাজ চলে না। একুশ শতকে প্রবেশের সময় চিত্রকরেরা দিকে দিকে আঁকতে থাকবে দৈত্যের সুন্দর মুখ। কামরুল হাসান ইয়াহিয়ার যে-মুখটি বিকৃত ক'রে দিয়ে গেছেন, সেটিকে চিত্রকরেরা আবার সুন্দর ক'রে তুলবে, ওই মুখকে দেখাবে চাঁদের মতো। কামরুল হাসান তখন নিষিদ্ধ হয়ে যাবেন, তাঁর অপরাধ তিনি দৈত্যকে দৈত্যরূপে এঁকেছিলেন।

আমি বাঙালির এমন ভবিষ্যৎ দেখতে পাই; একুশ শতকে বাঙালি প্রবেশ করবে এমনি রূপে। বিভিন্ন জাতি একুশ শতকে উপহার দেবে সভ্যতা, বাঙালি দেবে অসভ্যতা; তারা উপহার দেবে মনুষ্যত্ব, বাঙালি দেবে মনুষ্যত্বহীনতা। তারা বিকাশ ঘটাবে মানুষ ও সভ্যতার, আর বাঙালি দু-হাতে রুখবে মানুষ ও সভ্যতার বিকাশ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রঙিন আবর্জনা

আসলে আবর্জনার বাক্স, কিন্তু পৃথিবী জুড়ে মানুষেরা ওটি সাজিয়ে রাখে বসার ঘরে শোয়ার ঘরে; মাদকদ্রব্যের মতো টান বোধ করে ভেতরে ভেতরে ওটি দেখার জন্যে। পরিচারিকা, শিশু ও নিষ্ক্রিয় নারীরাই শুধু নয়; চিকিৎসক, প্রকৌশলী, অধ্যাপক, ব্যবস্থাপক ও সমাজের বিভিন্ন শিরেরা আক্রান্ত এ-আবর্জনামাদক দিয়ে। ওই আবর্জনা ও মাদক আক্রান্ত করে মগজকে, খুলির ভেতর দুপুর থেকে সন্ধ্যা থেকে মাঝরাত পর্যন্ত জমতে থাকে সময়ের বিস্তর আবর্জনা। ওটির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মানুষ এ-ছোটো গ্রহটি ভ'রে রূপান্তরিত হচ্ছে এক ইন্দ্রিয়ের প্রাণীতে—চোখ ছাড়া আর কিছু দরকার নেই তাদের। শুরুতে ছিলো সাদাকালো, তাতে চোখ কিছুটা জ্বলতো; এখন রঙিন আবর্জনাকে সোনার মতো রঙিন দেখায়, শয়তানের মুখকে দেবদূতের মুখ মনে হয়, মলখণ্ডকে মনে হয় হীরের টুকরো। বিশ শতকের বাস্তব মানুষকে ওই বাক্সটি ক'রে তুলেছে এক পরাবাস্তব বিশ্বের অধিবাসী। ওটি মাদকদ্রব্যের থেকে মারাত্মক, আণবিক বোমার থেকে ভয়াবহ কিন্তু এরই কাছে মানুষেরা সঁপে দিয়েছে উজ্জ্বল দুপুর, স্নিগ্ধ সন্ধ্যা ও কোমল রাত্রি। বাঙলাদেশের মতো দরিদ্র দেশে, যেখানে সব কিছুই কালো, সেখানে এর রঙিন রাজনীতিক তাৎপর্য রয়েছে। ওই বাক্সে দারিদ্র্যকে রঙিন সুন্দর লাগে, বন্যাকে মনে হয় সৌন্দর্যের ঢল, দুর্ঘটনা হয়ে ওঠে আকর্ষণীয়, একনায়কের মুখকে নায়কের মুখ ব'লে ভুল হয়।

গণতান্ত্রিক পুঁজিবাদী দেশগুলোতে ওই বাক্সটি হচ্ছে বিনোদন, ও আরো বিনোদন, ও আরো বিনোদন, অর্থাৎ আরো মনোরম মাদক, ও আরো মারাত্মক মাদক; স্বৈরাচারী একনায়ক পর্যুদস্ত দেশগুলোতে ওই বাক্সটি হচ্ছে আরো স্বৈরাচার, আরো পীড়ন, আরো অধিকারহরণ। বিলেতি-ফরাশি-জর্মান বাক্সে প্রধানমন্ত্রী পাঁচ মিনিট মুখ দেখানোর সুযোগ পায় না, পাতিদের কথাতো ওঠেই না; আর তারা যখন সুযোগ পায়, ঘরে ঘরে বাক্স বন্ধ হয়, তাই পপগানের ফাঁকে ফাঁকে মুখ দেখাতে হয় তাদের। নইলে ওই মুখ কেউ দেখতে চায় না। মন্ত্রীর মুখ দেখার জন্যে তারা ঘরে ঘরে বাক্স রাখে না। স্বৈরাচারী দেশগুলো একনায়কদের পায়ের নিচে; সেখানে বাক্সটিতে সারাক্ষণ সেঁটে থাকে তাদের মুখমণ্ডল। একটি আফ্রিকি দেশে অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার সাথে সাথে আকাশ থেকে ধীরে ধীরে নেমে আসে একনায়কের মুখচ্ছবি, তাকে ঘিরে সূর্য ওঠে, চাঁদ অস্ত যায়, আকাশ গাঢ় নীল হয়ে ছড়িয়ে থাকে। আরেকটি আফ্রিকি দেশের মহান নেতা ভাষণ দেন দিনের পর দিন, আর দিনের পর দিন ধারাবাহিকভাবে তার মুখ, চিৎকার, হাত নাড়া দেখে জনগণ। এক ইউরোপী ওই দেশে গিয়ে বুঝতে পেরেছিলো সে কতো নির্বোধ। একটি নতুন বাক্স কিনে ঘরে এনে খুলেই সে দেখে দেশনায়কের মুখ, দেখেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে বাক্স বন্ধ করে; আবার দু-ঘণ্টা পরে খুলে দেখে সেই মুখ, পরের দিন খুলেও দেখে সেই মুখ, এবং তার ও পরের দিন খুলে দেখে পর্দায় সেঁটে আছে ত্রাণকর্তার মুখ। সে বাক্সটি নিয়ে ছুটে দোকনে যায়, জানায় যে তাঁর বাক্সটি নষ্ট, কারণ যখনি সে বাক্স খোলে তখনি দেখতে পায় পর্দায় সেঁটে আছে মহানায়কের মুখমণ্ডল। নিশ্চয়ই বাক্সটি নষ্ট, নইলে কেনো দিনের পর দিন একই মুখ সেঁটে থাকবে? দোকানি ওই নির্বোধ ইউরোপীকে জানায় যে তার বাক্সটি শুধু ঠিকই নেই, আছে তার শ্রেষ্ঠ অবস্থায়, কারণ তাদের মহানায়ক দিনের পর দিন ভাষণ দেয়, আর মহানায়কের মুখ যদি বাক্সে ধরা পড়ে তবে বুঝতে হবে বাক্সটি তার শ্রেষ্ঠ অবস্থায় রয়েছে। বাঙলাদেশে এ-বাক্সের পঁচিশ বছর হচ্ছে একনায়কত্বের পঁচিশ বছর; এক বড়ো একনায়ক এর উদ্বোধন করেছিলো, আর এক ছোটো একনায়ক তার পঁচিশপূর্তি উৎসব পালন করছে। এখন পালিত হচ্ছে তৃতীয়মানের স্বৈরাচারের রজতজয়ন্তী। এ-বাক্স দিনের পর দিন বাঙালিকে উপহার দিয়েছে একনায়কের মুখ, তার পরিবারের মুখ, তার ভৃত্যদের মুখ। এ-একনায়কত্বের আরেকটি দিক হচ্ছে বাক্সের সঙ্গে জড়িত সকলের প্রতিভার হঠাৎ বিকাশ। কর্মচারীরা এতে হঠাৎ অভিনেতা হয়ে ওঠে, নাট্যকার হয়ে ওঠে কেউ, তাদের সন্তানেরা হয়ে ওঠে গায়ক, নর্তকী, স্ত্রীরাও বাদ যায় না। আবর্জনা সম্প্রচারের প্রধান হয়ে যেই আসে সে-ই টের পায় তার ভেতরে একটা মস্ত শেক্সপিয়র ঘুমিয়ে আছে, খুঁচিয়ে তাকে সে জাগিয়ে তুলে, আর সাতজন অধস্তন সমকালীন শেক্সপিয়রের মাথার আবর্জনাকে নাট্যরূপ দেয়।

এ-বাক্স পঁচিশ বছর ধ'রে বাঙালিকে কী উপহার দিয়েছে? এর প্রথম উপহার একনায়কত্ব; এ-বাক্স একনায়কত্বকে ব্যাপক করেছে, একনায়ককে ক'রে তোলেছে নায়ক। এরপর উপহার দিয়েছে একগুচ্ছ ভাঁড়। ভাঁড়দের জনপ্রিয় করেছে। এ-বাক্স দেশ থেকে নাটক ধারণাটি দূর করতে সমর্থ হয়েছে। গত দু-দশকে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশিসংখ্যক নাটক উৎপাদিত হয়েছে এ-বাক্সে যার একটিও নাটক নয়। সোপ অপেরা বা 'সাবানপালা'কে পরিচিত করিয়েছে নাটক নামে। এ-বাক্সটি অধ্যাপকদের বিদূষকে পরিণত করেছে। এ-বাক্সের অধ্যাপকেরা সেজেগুজে গান আর নাচের আসর উপস্থাপন করে, ইউরোপ-আমেরিকা হ'লে তাদের চাকুরি যেতো, কিন্তু এখানে তা গৌরবজনক। এ-বাক্স ঘরে ঘরে বালিকাদের নষ্ট করেছে, তাদের বুঝিয়েছে অভিনেত্রী হ'তে পারাটাই জীবনের সার্থকতা। এ-বাক্স 'সংবাদ' শব্দটিকে চিরকালের জন্যে নষ্ট ক'রে দিয়েছে। আমাদের বুঝিয়েছে যে পদ্মায় লঞ্চডুবিতে আড়াই শো যাত্রীর মৃত্যু কোনো সংবাদ নয়, তবে রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপকদের বক্তৃতা মাত্রই সংবাদ। এ-বাক্স পঁচিশ বছর ধ'রে ভুল বাঙলাভাষা ও ভুল বানান উপহার দিয়ে আসছে বাঙালিকে। এ-বাক্স 'কবী' বানান প্রচার করতেও লজ্জা পায় না; আর এ-বাক্সই আমাদের শিখিয়েছে যে ব্যবস্থাপকেরা 'বক্তৃতা' প্রসঙ্গে' কোনো কথা বলে, বক্তৃতায় বলে না—এবাক্স আমাদের শিখিয়েছে যে ধর্মকর্ম করার ভালো জায়গা হচ্ছে সম্প্রচারকক্ষ, আর বুঝিয়েছে যে প্রতিক্রিয়াশীলতাই জীবনের আলো। এ-বাক্স আমাদের একটি সত্য উপহার দিয়েছে যে রাজাকারই গুরুত্বপূর্ণ, মুক্তিযোদ্ধা নয়। এ-বাক্স গত কয়েক বছরে মুক্তিযুদ্ধকে হাস্যকর করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুলেছে; তারা মুক্তিযুদ্ধের যে-সব নাটক দেখিয়েছে তাতে মুক্তিযুদ্ধকে পরিণত করেছে ভাঁড়ামোতে। এ-উৎসব দেখে একটি জিনিশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে তারা ওয়াণ্ডার ওম্যান-এর মতো ছবি তৈরি করেছিলো, আর ইংরেজি ছবিই তারা ভালো তৈরি করতে পারতো; বুঝিয়েছে যে বাঙলা অনুষ্ঠানগুলো তারা প্রযোজনা করেনি। বাঙলাদেশে এক সময় তেরো পার্বণ ছিলো; এখন চাষীরা উৎসব করতে পারে না, কিন্তু সরকারি চাষীরা মাসে মাসে উৎসবে মেতে উঠে।

একটি প্রশ্ন মনে জাগে যে পঁচিশ বছর পর কি ঢাকায় কোনো আবর্জনা সম্প্রচারকেন্দ্র থাকবে, থাকলে ওই আবর্জনা কেউ খাবে? ঢাকায় হয়তো কেন্দ্র থাকবে, কিন্তু সেটি হয়ে পড়বে পুরোপুরি অপ্রয়োজনীয়, কেননা তার আবর্জনা কেউ চেখেও দেখবে না। তখন হয়তো সেটিকে বিলুপ্ত ক'রে দিতে হবে। সম্প্রচারপ্রক্রিয়ার যে-উন্নতি হচ্ছে দিন দিন, তাতে আগামী দশ বছরে গ্রামের চাষী নিজের বাক্সে কেঁপে উঠতে দেখবে নগ্ন মার্কিন রূপসীকে, বস্ত্র খুলে ফেলতে দেখবে ফরাশি তিলোত্তমাকে, চোখের সামনে বিকশিত দেখবে ভারতীয় দ্রৌপদীদের; তখন এমন চাষী কোথায় পাওয়া যাবে, যে বাক্স খুলে দেখবে একনায়কের মুখ, শিখবে ধর্মকর্ম, আর তাকাবে তৃতীয় মানের ভাঁড়দের ক্রিয়াকলাপের দিকে? জাহাজ মার্কা আলকাতরার বিজ্ঞাপনটিকে আমার খুবই তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়। তবে বিজ্ঞাপনটি অসম্পূর্ণ। বিজ্ঞাপনটিতে জালে, জাহাজে, নৌকোয়, টিনের চালে ওই আলকাতরা লাগানোর উপকারিতার কথা বলা হয়; কিন্তু বলা জরুরি ছিলো যে জাহাজমার্কা আলকাতরা লাগানোর সবচেয়ে উপযুক্তস্থল হচ্ছে টেলিভিশনের পর্দা, বিশেষ করে যখন তাতে ধরা প'ড়ে বিটিভির অনুষ্ঠান। বিজ্ঞাপনটি হয়তো অচিরেই সংশোধিত হবে, এবং বাস্তবায়িত হবে বাঙলার ঘরে ঘরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইচ্ছে হয় শিশু হয়ে যাই

গুন্টার গ্রাসের নায়ক শৈশবেই ঠিক করেছিলো সে আর বড়ো হবে না। ওটুকু বয়সেই সে চারপাশে যতো পাপ দেখেছে, তাই যথেষ্ট তার জন্যে। বড়ো হওয়ার বদলে সে বেছে নিয়েছিলো তার টিনের ঢাক বাজিয়ে বেড়ানোর সুখ। আমার এখন বড়ো বেশি ইচ্ছে হয় শিশু হয়ে যেতে; ইচ্ছে হয় ফিরে যাই শৈশবে, সে-পুকুরপাড়ে, গাছের ছায়ায়, ধানখেতের আলে, খেলার মাঠে, বৃষ্টির শব্দের ভেতরে, খেজুর রসের সুগন্ধে। যদি থেকে যেতে পারতাম বাঁশবাগানের চাঁদের নিচে, থোকায় থোকায় জোনাকির আলোতে, কার্তিকের কুয়াশায়, মাঘের শিশিরে; থেকে যেতে পারতাম যদি মাছরাঙা আর আমের বোলের সংস্পর্শে, তাহলে এতো বিষ পান করতে হতো না, এতো পাপের কামড় সহ্য করতে হতো না। আমার মতো অনেকেই হয়তো এরকম বোধ করে আজকাল। যদি শিশু হয়ে যেতে পারতাম বা থেকে যেতে পারতাম সেই গ্রামের কিশোর, তবে ভোগ করতে হতো না শয়তানের কপটতা, একনায়কের গণদরদ, মূর্খের পণ্ডিতি, স্বার্থপরায়ণের নিঃস্বার্থপরতা, অসতীর সতীত্ব, শোষকের সমাজসেবা, প্রতিক্রিয়াশীলের প্রগতিশীলতা, অন্ধের অন্তর্দৃষ্টি, বামনের আকাশচুম্বিতা, ষড়যন্ত্রকারীর মহত্ত্ব, অসত্যের সততা। যা শুনতে চাই না, তা শুনতে হতো না; যা দেখতে চাই না, তা দেখতে হতো না; যা বিশ্বাস করি না, তা বিশ্বাস করতে হতো না। এখন ডুবে আছি অতল আবর্জনার মধ্যে। এ-সমাজরাষ্ট্রসভ্যতা হয়ে উঠেছে এক বিশাল আবর্জনাস্থল, একে বদলে দেয়ার শক্তি নেই আমার, এর বদলের কোনো সম্ভাবনাও নেই। এতে গ্রস্ত হচ্ছি আমি ও আমার মতো অসংখ্য মানুষ। তাই ইচ্ছে হয় চলে যাই শৈশবে। যদি যেতে পারতাম শৈশবে, যখন আমার চোখের সামনে শুধু স্বপ্ন ছিলো! এখন কোনো স্বপ্ন নেই, চোখে শুধু অন্ধকার। যা দেখছি চারপাশে, তাতে প্রতিটি শিশুকে বলতে ইচ্ছে হয় : শিশুরা তোমরা বেড়ো না; শিশু থেকে যাও। যদি বাড়ো, কিছু পাবে না; শুধু স্বপ্নটুকু হারাবে। তুমি যদি বেড়ে ওঠো শিশু, তবে দেখবে পাপের কোনো শেষ নেই, তুমিও জড়িয়ে পড়বে ওই পাপে। এ-সমাজ নষ্ট করবে তোমাকে, যদি তুমি নষ্ট না হও তবে বিনষ্ট করবে তোমাকে। এ-রাষ্ট্র তোমার ভেতরের মানুষটিকে ক'রে তুলবে পশু। এ-সভ্যতা তোমাকে পরিণত করবে মধ্যযুগের অন্ধে। শিশু, তুমি বেড়ো না; তবে আমার মতো যন্ত্রণায় জ্বলবে। দানবেরা নিয়ন্ত্রণ করবে তোমাকে, লুসিফার হয়ে উঠবে তোমার প্রভু। তার হাতে তুলে দিতে হবে তোমার আত্মা। শিশু তুমি বেড়ো না। আমি যে- ভুল করেছি, তুমি সে-ভুলের শিকার হয়ো না। বরং আমি তোমার মতো শিশু, তোমার মতো কিশোর হয়ে যেতে চাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনে পড়ে পুকুরের হাঁসগুলোকে, কচুরিপানাকে, হিজলের লাল চেলিকে। একটি বাছুর লাফিয়ে চলছে বিলের দিকে, আকাশে মেঘ করেছে, খেজুরের রস জমছে হাঁড়িতে, কুয়াশা নেমে আসছে, টিনের চালে বৃষ্টির শব্দ হচ্ছে। এসবের মধ্যে কোনো পাপ ছিলো না, আবর্জনা ছিলো না। অঘ্রাণের পাকা ধানে, জমিতে ছড়িয়ে থাকা খড়ে কোনো কপটতা ছিলো না। ওই নিষ্পাপতার পৃথিবী থেকে আমি এখন কোথায় উঠে এসেছি ভাবলে হাহাকার ক'রে উঠতে ইচ্ছে হয়। যে-রাজনীতি নিয়ে দিনরাত ব্যস্ত থাকছে রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক থেকে নর্দমার কীটেরা, তার কথা ভাবলে ঘেন্নায় সৌরলোক প্লাবিত হয়ে যায়। ক্ষমতাধিকারী দল আর বিরোধী দল, জনসভা, মিছিল, হরতাল, ভেতরে ভেতরে সম্পর্ক, আমদানিরপ্তানি, পারমিট, দুপুরে সরকারে বিরুদ্ধে সংগ্রাম রাতে সম্প্রীতি, গরিবের নামে উত্তাল আবেগ আর শীততপনিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসবাস হোটেল, মোটেল, পাঁচতারা, শহীদ মিনার, দালালি, বড়ো বড়ো বুলি, প্রগতিশীলতা আর গোপনে সুবিধাবাদ এসব দেখে শুনে কার ইচ্ছে হয় থাকি এ-অতলান্ত আবর্জনার মধ্যে? বেড়ে ওঠায় বিশেষ সুখ নেই। বেড়ে ওঠার অর্থ কামড়াকামড়ি, বেড়ে উঠার অর্থ থুতু ছিটাছিটি, বেড়ে উঠার অর্থ পেছনে ছুরি মারামারি। দাঁতে সবসময় লেগে থাকে প্রতিদ্বন্দ্বী কুকুরের ছেঁড়া মাংস আর রক্ত, মুখে লেগে থাকে বদমাশের থুতু, পিঠে সব সময় গেঁথে থাকে বিষাক্ত ছুরি। এই তো বেড়ে ওঠা বাঙলাদেশে বেড়ে ওঠা হচ্ছে স্বর্গ ছেড়ে নরকের দিকে যাত্রা, বেড়ে ওঠা হচ্ছে চাঁদের দিকে পিঠ ফিরিয়ে মারাত্মক চুল্লির দিকে এগোনো। কোনো বেড়ে-ওঠা মানুষের বুক যদি খুলে দেখা যেতো, তাহলে দেখা যেতো সেখানে কোনো বৃষ্টির ফোঁটা নেই, পানির কম্পন নেই, ফুল নেই, নদী নেই, সবুজশ্যামল বনভূমি নেই। সেখানে আছে পোড়া কাঠ, কয়লা, জংধরা ছুরিকা, নিহত প্রতিদ্বন্দ্বী, এমন কি নিজের লাশ। এই তো বেড়ে ওঠা। বেড়ে উঠতে হ'লে পেরিয়ে আসতে হয় অনেক নিষিদ্ধ গলি, পিষে আসতে হয় নিজেরই অসংখ্য মৃতদেহ। আমি এভাবে বেড়ে উঠতে চাই নি, চাই না শিশুরা বেড়ে উঠুক এভাবে।

জানি শৈশবে ফিরে যাওয়ার কোনো পথ নেই; কোনো উপায় নেই শৈশবে থেকে যাওয়ার। কিন্তু এ-অসম্ভবেরই আরাধনা করি আমি। এ যদি পলায়নবাদ হয়, তবে তাই। নষ্ট সময়, সমাজ, রাষ্ট্র, রাজনীতিতে থাকার চেয়ে পালিয়ে বাল্যকালে চ'লে যাওয়া অনেক ভালো। কোনো সংঘের প্রধান হওয়ার চেয়ে ভালো বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে থাকা, মুখে কুয়াশা মাখা। রাজপথকে উচ্ছ্বসিত ক'রে তোলার চেয়ে অনেক সুখের ভোরের রোদে ব'সে থাকা। শীততাপনিয়ন্ত্রিত কক্ষে ব'সে থাকার চেয়ে অনেক সুখকর শিশিরে পা ভিজিয়ে কুঁড়েঘরের দিকে ফিরে আসা। অজস্র মাইক্রোফোনের আকুল চিৎকারে সাড়া দেয়া থেকে একটি বুনোপাখির ডাকে কেঁপে ওঠা অনেক মধুর। তাত্ত্বিকদের উৎকট তত্ত্ব, প্রয়োগবাদীদের প্রণালিপদ্ধতি, অজস্র সম্মেলনের থেকে সুখকর পুকুরের ঠাণ্ডা পানিতে পানিতে সাঁতার দেয়া। বাঙলার দিকে দিকে লাখ লাখ শিশু বেড়ে উঠছে, যেমন বেড়ে উঠেছিলাম আমি একদিন। তাদের অধিকাংশরই অবশ্য পরার পোশাক নেই, ঘুমোনোর ঘর নেই, মাটির বাসনে ভাত নেই। তাদের বাল্যকালই নেই। তাদের বাল্যকালই দোজখের চেয়ে দুঃস্বপ্ন। তাদের তো ফিরে যাওয়ার কথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মায়ের উষ্ণ জরায়ুতে। তাদের আর কোনো ভালো গন্তব্য আমি দেখি না। যারা বেড়ে উঠেছে আমার মতো, পোশাক-ভাত-ঘর যাদের সমস্যা নয়, তারা একদিন স্বপ্ন নিয়ে সমস্যায় পড়বে। বাঙলার কর্কশ আগুনে তাদের সবুজ পুড়ে যাবে, কয়লা হয়ে উঠবে তাদের আত্মা। তাদের মর্মস্পর্শী ভবিষ্যতের কথা ভেবে শিউরে উঠি। জড়িয়ে পড়বে তারা অজস্র পাপে। রাজনীতি তাদের শয়তান ক'রে তুলবে, সমাজ তাদের ক'রে তুলবে পিশাচ, রাষ্ট্র তাদের ক'রে তুলবে পাপিষ্ঠ। শিশুদের জন্যে এমন ভবিষ্যৎ কী ক'রে প্রার্থনা করি? আমি নিজেই তো ফিরে যেতে চাই শৈশবে, আম আঁটির ভেঁপু বাজিয়ে জানাতে চাই : শিশুরা, তোমরা বেড়ো না, বাড়লে একদিন তোমাদের অনুশোচনা করতে হবে। এখানে বেড়ে ওঠা পাপ, এখানে বেড়ে ওঠা দুঃস্বপ্ন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুমূর্ষু প্রজন্ম

তরুণতরুণীরা কেমন আছে এখন, তা আমি ঠিক জানি না, যদিও আমার বাস অনেকটা তাদের মধ্যেই। এমনকি বলা যেতে পারে প্রতি বছর আমারই বয়স বাড়ছে এক বছর করে, কিন্তু আমার প্রতিবেশের বয়স বাড়ছে না, প্রতিবছর নতুন তরুণতরুণীরা এসে প্রতিবেশকে তারুণ্যমুখর করে রাখছে। চার বছর আগে যারা এসেছিলো, তাদের চোখেমুখে কিছুটা ধূসরতা লেগেছে, দু-বছর আগে এসেছিলো যারা তাদের মুখের ওপর ধূলো জমতে শুরু করেছে; এবার যারা এলো, তাদের মুখ বেশ টাটকা। এদের মুখেও জমবে ধূলো দেখা দেবে ধূসরতা, আর নতুন টাটকা মুখ নিয়ে আসবে নতুনেরা। এদের মাঝখানে আছি, তবু মনে হয় কতো দূরে আছি। এক সময় আমি যেমন দূরে ছিলাম আমার পিতার থেকে, এরা যেনো তার থেকেও আমার অনেক দূরে। আমি কিছু বাঁধাবুলি বছর বছর আবৃত্তি করি। এক সময় বেশ আবেগে আবৃত্তি করতাম, এখন সে-আবেগটুকুও নেই, আর আমার সামনে বসে যারা ওই গৎ শোনে, তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হয় তারা কিছু শুনছে না, কিছু দেখছে না, তাদের কোনো ইন্দ্রিয় কাজ করছে না। এক সময় তাদের অনেকের চোখে ঝিলিক দেখতাম, এখন তা দুর্লভ হয়ে উঠেছে; এক সময় অনেকে আমার অভাবিত কথা শুনে চোখাচোখি করতো, এখন তাও করে না। কোনো উদ্দীপক তাদের উদ্দীপ্ত করে না, কিছুতেই তারা সাড়া দেয় না। তরুণীদের অনেকেই শুভবিবাহ উৎসবের শাড়ি পরে আসে, হয়তো মাঝে মাঝে ঠোঁটের যত্ন নেয়, কিন্তু জ্ঞান তাদের আলোড়িত করে বলে মনে হয় না। তরুণদের অনেকে পোশাকের চূড়ান্ত করে, বারান্দায় দীর্ঘতম সিগারেটের পরিচর্যা করে, কিন্তু সাড়া দেয় না। বারান্দায় তারা কোলাহল করতে ভালোবাসে, চিৎকার করে অতি উচ্চকণ্ঠে, মাতামাতি করে কারণে-অকারণে, একদল এগারোটা বাজলেই শ্লোগান নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। আমি এদের মধ্যে আছি, তবু আছি যেনো সহস্র কিলোমিটার দূরে। আমি তাদের বাস্তবতা জানি না, জানি না তাদের স্বপ্ন, তাদের কামনাবাসনার ঠিকানা, বুঝতে পারি না তাদের রক্তমাংসের স্পন্দন। জানি না তারা কখন ঘুম থেকে ওঠে, জানি না রাতে তাদের ঘুম হয় কিনা; জানি না তারা কখন গোসল করে, দাঁত মাজে কিনা, জানি না তারা কী পড়ে, আদৌ পড়ে কিনা। জানি না মাংস তাদের কতোটা উত্তেজিত রাখে, ক্ষুধা তাদের কতোটা কাতর করে। জানি না তাদের স্বপ্নে কতোটা থাকে টাকার মুখ, কতোটা থাকে সহপাঠিনীর বা পাশের বাসার তরুণীর মুখাবয়ব। মাঝে মাঝে তাদের সম্পর্কে গুজব শুনি—তারা অন্য রকম হয়ে গেছে, সময় তাদের নষ্ট করে ফেলেছে, তারা পরিণত হয়েছে এক মুমূর্ষু প্রজন্মে, এরকম নানা সংবাদ শুনি বিশ্বস্ত সংবাদদাতাদের মুখে। ষাটের দশকের স্বপ্নের সাথে নাকি কোনো মিল নেই আশির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দশকের স্বপ্নের; ষাটের দশকের কামনাবাসনার সাথে নাকি কোনো গোত্রীয় সম্পর্ক নেই আশির মুমূর্ষু প্রজন্মের কামনাবাসনার। তারা এক মুমূর্ষু উদ্ধারহীন প্রজন্ম এমন বাণী শুনি।

শুনেছি লেখাপড়াটাকে তারা আর গুরুত্বপূর্ণ ভাবে না, ঈর্ষা করে না প্রথম শ্রেণী প্রাপ্তদের; বরং প্রথম শ্রেণী পাওয়াটাকে ভাবে জীবনের এগোনোর প্রথম বড়ো বাধা। প্রথম শ্রেণী মানে তো বিশ্ববিদ্যালয়, আর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ হচ্ছে জীবনটাকে নিজের হাতে নষ্ট করা। বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘুষ নেই, পীড়ন করার মতো ক্ষমতা নেই, গাড়ি নেই, ভবিষ্যতে বাড়ি নেই, জীবনে কোনো রূপসী নেই। রূপসীরা এখন মাধ্যমিকে ফেল করা ফুটবল খেলোয়াড় চায়, কোনো প্রথম শ্রেণীকে চায় না। শুনেছি তারা শিক্ষককে 'স্যার' বলার চেয়ে বীমার দালালকে 'স্যার' বলতে পছন্দ করে। তারা বিভাগের শ্রেষ্ঠ শিক্ষকদের নামও জানে না, জানার উৎসাহও বোধ করে না; কিন্তু টেলিভিশনের সহপ্রযোজকদেরও নাম জানে। শুনেছি তারা টাকা ছাড়া আর কিছুতে বিশ্বাস করে না। এক তোড়া টাকাকে তারা পুণ্যগ্রন্থর থেকেও বেশি শ্রদ্ধা করে। ক্ষমতায় তারা বিশ্বাস করে এবং ক্ষমতায় যাওয়ার পেছনের গলিগুলোর ঠিকানা ডাকপিয়নের থেকেও নির্ভুলভাবে জানে। ধর্মকর্মের দিকেও নাকি অনেকেই আসক্তি রয়েছে; পীরদের ঠিকানা জানে। সবচেয়ে উদ্ভিন্ন তরুণীটিও মাইক্রোফোন শুঁকে ঘোমটা দেয়ার চেষ্টা করে। প্রেমেও নাকি তাদের আর আসক্তি নেই। ষাটের দশকের তরুণেরা প্রেমের জন্য পাগল ছিলো, ব্যাকুল ছিলো সহপাঠিনীদের মুখ দেখার জন্যে। এখন এটা নাকি হাস্যকর। তারা নাকি সহপাঠিনীদের 'আপা' বলে, তাদের নিয়ে কোনো স্বপ্ন দেখে না; বরং স্বপ্ন দেখে গ্রামের চেয়ারম্যানের মেয়েকে। তরুণীরা উচ্চশিক্ষা নিয়ে এখন নাকি নিজেদের পায়ে কুড়াল মারতে বসেছে; এম এ পাশ তরুণীর জন্যে আইএ পাশ মধ্যপ্রাচ্যের ড্রাইভার প্রস্তাব পাঠায়। এমএ পাশ তরুণীর বিয়ে হয় বিএ পাশ তরুণের সাথে, যদি তার পিতা তার মেয়ের থেকেও আকর্ষণীয় হোন্ডা, রঙিন টিভি দিতে পারে। তারা খুবই হতাশ, তাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় অপচয় হয়ে যায়। এক সময় একুশ বছরে তরুণেরা বেরিয়ে যেতো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, এখন অনেকেই ঢোকে একুশ বছরে, আর কখন বিশ্ববিদ্যালয় তাদের নিষ্কৃতি দেবে, তা কেউ জানে না। মানুষের জীবনের সবচেয়ে তীব্র, সংরক্ত, কামনাবাসনাকম্পিত সময়টি তারা অপচয় করে যখন বেরোয় তখন সামনে দেখে সামাজিক মরুভূমি তাদের জন্যে একটুও ছায়ার ব্যবস্থা রাখে নি।

মানুষ স্বয়ম্ভূ নয়, এ-মুমূর্ষু প্রজন্মও জন্ম দেয় নি নিজেদের। এ-সমাজই তার জন্মদাতা। আমাদের সমাজরাষ্ট্র এমন জনক, যে তার উত্তরাধিকারীদের যৌবনেই মুমূর্ষু করে ফেলে; যযাতির মতো সন্তানের যৌবন, সংরাগ, কামনাবাসনা কেড়ে সম্ভোগ করে নিজে। সমাজরাষ্ট্র যারা চালাচ্ছে, যারা নিয়ন্ত্রণ করছে রাজনীতি, অর্থ, শিক্ষা তারাই এ-মুমূর্ষু প্রজন্মের জনক। তারা ভাবছে না তরুণতরুণীদের কথা, যারা সুস্থভাবে বেড়ে উঠে নিজেদের প্রতিভায় রূপান্তরিত করে দিতে পারে সমাজকে। বরং জনকেরা ব্যস্ত নিজেদের নিয়ে, তারা নিজেদের কামনায় থরথর করে কাঁপছে, বাসনায় উত্তেজিত থাকছে, উদ্দীপ্ত থাকছে সম্ভোগে। দেশের দিকে তাকালে মনে হয় এটা যেনো বার্ধক্যে

আমার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যৌবন আর যৌবনে বার্ধক্যের দেশ। ক্ষমতাধিকারী বাতিল বুড়োদের গাল থেকে চর্বি বেয়ে পড়ে, হাসি ঝকঝক করে, কামনা জ্বলজ্বল করে ঠোঁট জুড়ে। আর মুমূর্ষু প্রজন্মের মুখমণ্ডল বিবর্ণ, হাসিতে ধূসরতা, ঠোঁটে শুষ্ক। বেশ কয়েকটি বাতিল বুড়োকে দেখেছি আমি, যারা কুঁকড়ে গিয়েছিলো অবসর নেয়ার পর ধরাধরি করে যেই তারা বসলো গিয়ে শক্তিমান আসনে, অমনি তাদের মুখে দেখা দিলো আভা, দাঁত শক্ত হয়ে উঠলো, বাহু এতো আবেগপরায়ণ হযে উঠলো যে সামনে যে-তরুণীকে পায়, তাকেই জড়িয়ে ধরে! বাতিল বুড়োরা এখানে উপভোগ করে আর যুবক যুবতীরা হয় অপচয়িত। সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন পরিকল্পনার মধ্যে প্রধান পরিকল্পনাটি হওয়ার কথা নতুন প্রজন্মকে নিয়ে, কিন্তু এ দেশে তাদের নিয়েই কোনো পরিকল্পনা নেই। তারা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে অপরিকল্পিতভাবে। ইয়েটস এক মুমূর্ষু প্রজন্মের কথা বলেছিলেন, যারা ছিলে একে অপরের বাহুতে আলিঙ্গনাবদ্ধ।, সুর ও সুরার প্রাচুর্যে মুমূর্ষু; আর বাঙলাদেশ জন্ম দিচ্ছে একের পর এক মুমূর্ষু প্রজন্ম, সমাজরাষ্ট্র যাদের অস্বীকার করেছে, জীবন তাদের প্রত্যাখ্যান করেছে। মাদক তাদের জন্যে যতোটা অভিশাপ, তার চেয়ে অনেক মর্মান্তিক অভিশাপ রাষ্ট্র ও সমাজ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হরতালের অর্থনীতি ও বিকল্প ভাষা

দেশে গণতন্ত্র ও বাকস্বাধীনতা সম্পর্কে আমার গভীর সন্দেহ ছিলো; কিন্তু সম্প্রতি ওই সন্দেহে একটু ফাটল ধরেছে, দেখতে পাচ্ছি দেশে বিস্ময়করভাবে কিছুটা গণতন্ত্র আর বাকস্বাধীনতার পুনর্জন্ম ঘটেছে। কিছুকাল আগেও 'হরতাল' শব্দটি নিষিদ্ধ ছিলো, তার পত্রপত্রিকায় মুদ্রিত হওয়ার অধিকার ছিলো না; এখন শব্দটি বড়ো অক্ষরেও ছাপা হচ্ছে। আগে এর সুভাষণ বা বিকল্প ভাষণ ছিলো 'কর্মসূচী'। এ-শব্দটি অন্তত স্বাধীনতা ফিরে পেয়েছে। আগে হরতাল প্রতিরোধের সশস্ত্র ব্যবস্থা নেয়া হতো; সম্প্রতি সরকার আশ্রয় নিয়েছে গণতান্ত্রিক ও মননশীল ব্যবস্থায়। সরকারি গবেষকরা আবেদন জানিয়েছে হরতালের বিকল্প ভাষা উদ্ভাবনের। 'ভাষা' শব্দটি বেশ লক্ষণীয়। তারা বলতে পারতো হরতালের বিকল্প উপায় বা ব্যবস্থা বা অন্য কিছুর কথা; তারা হরতালকে একটি 'ভাষা' হিসেবে গণ্য করে ভাষাবিজ্ঞানের এলাকাকে সরকারিভাবে সম্প্রসারিত করে দিয়েছে। এ-সরকার 'কবি'র সরকার, অভিনেতার সরকার, এখন দেখছি এটি ভাষাবিজ্ঞানীর সরকারও বটে। অর্থনীতি সব নীতির ওপরে; তাই সরকারি গবেষকরা আর্থনীতিক জুজু দেখিয়েই মানুষকে ভয় পাইয়ে দিতে চেয়েছে। তারা জানিয়েছে একদিনের হরতালে অপচয় ঘটে আড়াইশো কোটি টাকার। শুনে চমকে উঠেছি, আনন্দিত হয়েছি যে বাঙলাদেশে একদিনে আড়াইশো কোটি টাকার কাজ হয়। আড়াইশো কোটি টাকায় কতো কিছু করা যায়, বহু বুড়িগঙ্গা ও যমুনা সেতু বানানো যায়, আড়াইশো কোটি টাকায় হয়তো দশটা বিমান কেনা যায়, পঁচিশটা সোনারগাঁ হোটেল করা যায়, পঞ্চাশটি সৈন্যাবাস বানানো যায়, আড়াইশো মসজিদ নির্মাণ করা যায়, আড়াই হাজার তোরণ তৈরি করা যায়, আড়াই হাজার স্বতঃস্ফূর্ত জনসভার ব্যবস্থা করা যায়, আরো অনেক কিছু করা যায়। একদিনের অপচয়ের টাকা দিয়ে এতো কিছু করা যায়, তবে সারা বছরের সদ্ব্যবহারের টাকা দিয়ে রূপকথার রাজ্য বানানো যায়। সারা বছরে যদি আড়াইশো দিন সদ্ব্যহার হয়, তাহলে টাকার পাহাড় জমে যাওয়ার কথা। সারা বছরে আয় হওয়ার কথা ষাট হাজার কোটি টাকারও বেশি। নিশ্চয়ই ওই টাকা আয় হয়; তাই প্রশ্ন জাগে ওই টাকা কোথায় যায়? এতো টাকা আয় হওয়ার পর কোনো একটি যমুনা বা বুড়িগঙ্গার সেতুর জন্যে হাত পাততে হয় বিদেশের কাছে, কেনো জাতীয় বাজেট প্রতি বছর পরিণত হয় ভিক্ষার ঝুলিতে? কেনো শ্রমিকদের বেতন এতো কম, কেনো সরকারি কর্মচারীদের বেতনে মাসের দশদিনও চলে না? কেনো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর এমন দুরবস্থা, কেনো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকের এতো অভাব, কেনো বিশ্ববিদ্যালয়ে টাকার অভাবে কোনো গবেষণাই হয় না? এ-হিসেবটা সরকারের কাছে চাওয়ার অধিকার আছে জনগণের। আরো কিছু হিসেবও চাইতে পারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জনগণ। রাষ্ট্রীয় কাজে আর দলীয় কাজে রাষ্ট্রের কতো টাকা অপচয় করেন ব্যবস্থাপকেরা? স্বতঃস্ফূর্ত জনসভার জন্যে কতো ব্যয় হয়, তোরণের পেছনে ব্যয় কতো, বিদেশ ভ্রমণে কতো অপচয় ঘটে, তেলের খনি বিদেশির হাতে তুলে দেয়ায় রাষ্ট্রের অপচয় হয় কতো কোটি টাকা? মিহি অর্থনীতিবিদরা হয়তো এর হিসেব রাখেন, তবে সাধারণ মানুষের কাছে তা একটি বড়ো প্রশ্ন হয়ে আছে।

বোঝা যায় হরতাল এখন সরকারকে বিব্রত করে। আগে এ-সরকারকে কিছুই বিব্রত করতো না, এখন সরকার বিব্রত বোধ করার মতো মানসিক অবস্থা আয়ত্ত করেছে। বেশ গণতান্ত্রিক স্পর্শকাতরতা অর্জন করেছে। বিরোধী দলগুলোর রাজনীতিক ক্রিয়াকলাপের চূড়ান্তরূপ হচ্ছে হরতাল। সাতাশিতে ধারাবাহিক হরতালের অশেষ উদ্দীপনা আমরা দেখেছি। ওই হরতাল বাঙলাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে গণ্য হবে, তবে তা সফল হয়নি। সত্যিই কি সফল হয়? হরতালের সাফল্য হরতাল হওয়ায়। হরতাল ডাকা হয়েছে, দেশ ভরে হরতাল হয়েছে; দিনের পর দিন হয়েছে। এটা কি বড়ো সাফল্য নয়? হরতাল সরকার উৎখাত করতে পারে না, হরতাল পারে সরকারের ব্যর্থতা দেখিয়ে দিতে; হরতাল পারে সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের মনোভাব জানিয়ে দিতে; এর বেশি কিছু পারে না। এর বেশি কিছু পারে তখনি যখন সরকার হয় গণতান্ত্রিক, দায়িত্বশীল, জনগণের মনোভাবের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। যে-সরকার এসব গুণসম্পন্ন নয়, তাকে সারা মাস হরতাল করেও হটানো যায় না। হরতালের শর্তই হচ্ছে যার বিরুদ্ধে হরতাল করা হচ্ছে সে গণতান্ত্রিক, মানবিক, দায়িত্বশীল হবে। এককালে অনশন ধর্মঘট সফল হতো; কারণ শক্তিধরেরা জীবনের মূল্যে বিশ্বাসী ছিলো। যারা জীবনের মূল্যেই বিশ্বাসী নয়, যারা বন্দুক চালিয়ে মাঝে মাঝেই থামিয়ে দেয় মানবিক প্রতিবাদ, তাদের কাছে অনশনের কোনো মূল্য থাকতে পারে না। হরতালেরও মূল্য থাকতে পারে না। বাঙলাদেশে হরতাল হয় সফলভাবে, কিন্তু তা ব্যর্থ হয় অন্যভাবে। হরতালের যে-বিকল্প ভাষা বের করার আবেদন জানানো হয়েছে, তার ফল বিপজ্জনক হ'তে পারে। আবেদনকারীরা হয়তো ধ'রে নিয়েছে যে হরতালের বিকল্প হচ্ছে আবেদননিবেদন, কিন্তু তাতো সন্ত্রাসমূলকও হতে পারে। এক নেত্রী সে-কথা এর মাঝেই বলেছেন। হরতাল কী ঘোষণা করে? হরতাল জানিয়ে দেয় যে সরকারের ওপর জনগণের আস্থা নেই, জনগণ গণতন্ত্র চায়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নতুন সরকার গঠনের বাণীই প্রকাশ পায় হরতালে। এ-বাণী পাঠোদ্ধারের শক্তি থাকে না অগণতান্ত্রিক সরকারের। তাদের কাছে নিজেরা ক্ষমতায় থাকার নামই গণতন্ত্র।

সরকার রাজনীতিক হরতালের অর্থনীতি প্রকাশ করেছে, কিন্তু বাঙলাদেশে যে একরকম সামাজিক হরতাল সারা বছর চলে, তার অর্থনীতি প্রকাশ করেনি। তাতে দৈনিক কতো কোটি অপচয় হয়, জানানোও সরকারের দায়িত্ব; তার সমাধানও সরকারের কর্তব্য। উচ্চ মাধ্যমিক ছাত্রদের কথাই ধরা যাক। তাদের পরীক্ষা থেকে ফল প্রকাশে লাগে এক বছর, ফল প্রকাশ থেকে আবার ক্লাশ শুরু হতে লাগে এক বছর। লাখ খানেক ছাত্রের জীবনের সবচেয়ে সুন্দর সময়ের দুটি বছর বাধ্যতামূলক নিষ্ক্রিয়তায় বা রাষ্ট্রিক-সামাজিক হরতালে অপচয়িত হয়। এর আর্থমূল্য কতো? কতো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লক্ষ কোটি টাকা? বাঙলাদেশের অফিসে আট ঘণ্টা কাজ করার কথা। গড়ে সেখানে তিন ঘণ্টার বেশি কাজ হয় না। এতে দৈনিক অপচয় কতো? কারখানাগুলোতে ঠিক মতো উৎপাদন হয় না। এতে অপচয় হয় কতো কোটি? দেশে প্রতিদিন ঘুষে অপচয় হয় কতো কোটি, এক শো কোটি? এ-ধরনের বার্ষিক হরতাল দেশে লেগে আছে; এর অপচয় সম্পর্কে গবেষণা হওয়া দরকার। সরকার এতে রাজি হবে না। সরকার হরতালের অপচয়ের যে-হিসেব প্রকাশ করেছে, তা হরতালের বিরুদ্ধে লজ্জাজনক অপপ্রচার, এতেও অপচয় হয়েছে কয়েক লক্ষ টাকা। অর্থনীতিবিদেরা হিসেব করে দেখাতে পারেন যে এ-সরকার মূলত; অপচয়ের সরকার, উৎপাদনের সরকার নয়; তাই অপচয়ের কথা বলা তার সাজে না। হরতালের বিকল্প ভাষা হচ্ছে একটি সৎ শুদ্ধ গণতান্ত্রিক নির্বাচন, যাতে লুঠতরাজ হবে না, টেলিভিশন কেন্দ্রে বসে জয়পরাজয় নির্ধারণ করা হবে না। তাহলে দেখা যাবে জনগণ বিকল্প ভাষাটি ধ্বনি-শব্দ-বাক্য-অর্থে ঠিকমতো প্রকাশ করেছে; সরকারকে জানিয়েছে : বিদায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিতর্কিত ও অবিতর্কিত

এখন বাঙলাদেশে সম্ভবত একজন ছাড়া বাকি সবাই অবিতর্কিত। সবাই সকলের কাছে গৃহীত ও শ্রদ্ধেয়। কেরানি ও কর্তা, চোর ও দারোগারা অবিতর্কিত, মস্তান ও মন্ত্রী, গোলাপ ও গোলামেরা অবিতর্কিত, চাষী ও কবি, সাংবাদিক ও ঔপন্যাসিকেরা অবিতর্কিত; সবচেয়ে সুখের কথা মূর্খ ও মহাপুরুষেরাও অবিতর্কিত। শ্রদ্ধেয়, গৃহীত। যে-সমাজের সবাই এমন সুন্দর সুচারুরূপে অবিতর্কিত, শ্রদ্ধেয় গৃহীত, তাকে যদি চতুষ্পদ প্রাণীর সমাজ বলি, তাহলে বিতর্কের অবকাশ নেই। অপরাধ পর্ব এখানে কোনো শেষ নেই; এ-সময়টিকে বাঙলাদেশের ইতিহাসের অপরাধ পর্ব মনে ক'রে পথে পথে আমরা অপরাধ ক'রে চলেছি; কিন্তু সাবধান থাকছি যাতে পাছে কোনো বিতর্ক সৃষ্টি ক'রে না ফেলি। বিতর্ক সৃষ্টি খুব খারাপ ব্যাপার; তাতে শত্রু তৈরি হয়, গৃহীত শ্রদ্ধেয় হওয়ার পথ বন্ধ হয়ে যায়। রাজনীতিক সাবধান থাকে যাতে সে কোনো বিতর্ক তৈরি ক'রে না ফেলে; তাতে তার বর্তমানভবিষ্যৎ ঝরঝরে হয়ে যাবে। বুদ্ধিজীবী সাবধানে পাহারা দেয় নিজেকে, যাতে তার মুখ আর কলম থেকে এমন কিছু না বেরোয়, যা তাকে বিতর্কের আগুনে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারবে।

সমাজ এখন নানা প্রজাতির মহাপুরুষে ভ'রে গেছে। মহাপুরুষেরা সবাই অবিতর্কিত থাকার সাধক; অবিতর্কিত বটবৃক্ষের নিচের ব'সে তাঁরা অবিতর্কিত সত্য লাভের আপ্রাণ চেষ্টা ক'রে চলছেন। এদের সমষ্টিগত সাধনায় বাঙলায় চতুষ্পদী সমাজ প্রায় প্রতিষ্ঠিত। সমাজ সম্পর্কে যখন কথা বলেন মহাপুরুষেরা, কথা বলেন সাবধানে; রাষ্ট্র সম্পর্কে সাবধানে, ইতিহাস সম্পর্কে সাবধানে, ধর্ম-শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে কথা বলেন সাবধানে। পাঁচ-ছ দশক আগেও আমাদের পূর্বযাত্রীরা মুখ খুলে বিতর্ক করেছেন, কেউ কেউ শিকার হয়েছেন সমাজের মূর্খ আক্রোশের, তবুও তাঁরা বহু বিষয়ে কথা বলেছেন। এখন ওই সব কথা বলার সাহস কেউ করে না। জীবন বিপন্ন হ'তে পারে; তার চেয়ে বড়ো কথা জীবনের সোনালি স্বার্থ বিপন্ন হ'তে পারে। যে-সমাজে কোনো বিতর্ক নেই, সে-সমাজ মিথ্যায় আক্রান্ত; যে-সমাজে কেউ বিতর্কিত কথা বলে না বা বিতর্কিত কাজ করে না, সে-সমাজ সমর্থিত মিথ্যার পায়ে। এমন সমাজ পরখ না ক'রে মেনে নেয় প্রচলিত বাজে কথা; এবং তা প্রচার করে বিভিন্ন মাধ্যমে। বিতর্কহীন সমাজের মন ও মস্তিষ্ক পুরোপুরি নিষ্ক্রিয়, সেখানে কুকুরের মতো জেগে থাকে শুধু স্বার্থ। অমন সমাজ পশুধর্মীর সমষ্টি; অমন সমাজের মহাপুরুষেরাও সামান্য মানুষ। তাঁদের পক্ষে নতুন ও অসাধারণ কিছু সৃষ্টি করা অসম্ভব। এটা দেখতে পাই আমাদের সমাজে। যারা মহাপুরুষের মুখোশ প'রে আছেন চারদিকে, তাঁরা খুবই ক্ষুদ্র মানুষ। এমন সমাজে পণ্ডিত হয়ে ওঠেন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভৃত্য, সৃষ্টিশীল লেখক হয়ে ওঠেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফরমাশি পণ্য সরবরাহকারী, রাজনীতিক হয়ে ওঠেন গোলাম, দার্শনিকবিজ্ঞানীর উদ্ভবই ঘটে না। রোকেয়া কিছু কথা বলেছিলেন, যা এখন বললে তাঁকে চৌরাস্তায় অপদস্থ হ'তে হতো। নজরুল বলেছিলেন এমন সব মারাত্মক কথা, যা এখন বললে তাঁর পক্ষে জাতীয় কবি হওয়া দূরে থাক, বেঁচে থাকাই কঠিন হতো। এখন আমরা অমন মারাত্মক কথা বলি না। রাষ্ট্র ও সমাজকে ক্ষেপিয়ে তোলার মতো বোকামি তো করিই না, এমন কি একটি দুষ্ট লোককেও রাগাই না। তারও শক্তি আছে; আর সে ক্ষতি ও স্বার্থ বিপন্ন করতে পারে।

অবিতর্কিত সমাজ পুনরাবৃত্তিপ্রাণ; সে-সমাজের একশো বছর এক বছরের একশোবার পুনরাবৃত্তি মাত্র। এতে বয়স বাড়ে, আর কিছু বাড়ে না, কমে। সে-সমাজই সামনের দিকে এগোয়, যে-সমাজ দশকে দশকে জন্ম দেয় বিতর্কিত মানুষ, যারা সব কিছু সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন। আমাদের দেশে মুসলমান সমাজে প্রশ্ন তোলা ভয়ংকর ব্যাপার। শুধু যে প্রথাগত বিশ্বাসগুলো সম্পর্কেই প্রশ্ন তোলা ভয়ংকর, তাই নয়; যে-সমস্ত ব্যাপারের সাথে অন্ধ বিশ্বাসের কোনোই সম্পর্ক নেই, সে-সম্পর্কেও প্রশ্ন তোলা বা নতুন মত প্রকাশ করা যায় না। রাজনীতিক স্বৈরাচারের মতো অপবিশ্বাসের স্বৈরাচারও জাতিকে শেকল পরিয়ে বন্দী ক'রে রাখে। এ-ক্ষেত্রে বন্দী হয় জাতির সৃষ্টি ও মননশীলতা। একটি উদাহরণ দিই। নজরুল সম্পর্কে আমি একটি মন্তব্য করেছিলাম, আমার মন্তব্যটি প'ড়ে বোঝারও আগ্রহ কেউ বোধ করেনি, কিন্তু মেতে উঠেছিলো অনেকেই। তারা নজরুল সাহিত্যও পড়ে নি, আমার মন্তব্যও পড়ে নি। তাঁরা অন্ধভাবে আক্রমণে উদ্যত হয়েছিলো নতুন বক্তব্যকে। সাহিত্যকেই এখন ঠিক মতো বিচার করা কঠিন; যে-সব বিশ্বাস মানুষকে পুরোপুরি অন্ধ ক'রে ফেলে, সেগুলোকে পরখ করার কথা ভাবাও যায় না। পরখ করার সাহস করতে পারেন শুধু যারা প্রকৃতই মহাপুরুষ, যারা নিজেদের বিপন্ন ক'রে তুলতে ভয় পান না। পৃথিবীর অধিকাংশ মহাপুরুষ এখনো বিতর্কিত, কোনো গাধা সম্পর্কে পৃথিবীর কোনো প্রান্তে কোনো বিতর্ক নেই। ধর্মপ্রবর্তকদের নিয়েও বিতর্ক দেখা দেয়; প্লাতো-আরিস্ততল থেকে মার্ক্স-রবীন্দ্রনাথ আজো বিতর্কিত। প্লাতোকে এখনো প্রতিদিন অনেকেই,বাতিলের চেষ্টা করে, মার্ক্সকে শারীরিকভাবে আক্রমণের চিন্তা করে অনেকে, রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে ক্ষোভের শেষ নেই অনেকের। বিতর্কিত ব্যক্তিরা পৃথিবীকে বদলে দেয়, অবিতর্কিতরা উপভোগ করে, যেমন চতুষ্পদগণ উপভোগ করে খড়-বিচুলি-ঘাস।

বাঙলায় অসংখ্য বিতর্কিত মানুষ দরকার। প্রয়োজন বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বিতর্ক, জ্ঞানের এলাকায় বিতর্ক; দরকার রাজনীতিক, দার্শনিক বিতর্ক; দরকার সামাজিক বিতর্ক, দরকার শিল্প-সাহিত্য-স্বপ্নের জগতে বিতর্ক। জীবিত মানুষের সব এলাকায় সব বিষয়ে শেষ সিদ্ধান্ত চিরকালের জন্যে গৃহীত হয়ে যেতে পারে না; এবং পারে না আমাদের মতো সমাজে, যেখানে অধিকাংশ এলাকায়ই গৃহীত হয়ে আছে অপসিদ্ধান্ত। প্রশ্ন তোলার জন্যে মগজ ও প্রতিভা দরকার; বিশ্বাসের জন্যে অন্ধ হ'লেই ভালো। প্রশ্ন তুললেই বিতর্কিত হ'তে হবে, হ'তে হবে আক্রান্ত; তাই আমাদের সমাজে বিতর্কিত মানুষের অভাব। কিন্তু সাহস ক'রে প্রশ্ন তোলা প্রয়োজন। এখানে মুখোশপরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহাপুরুষদের একটি ভূমিকা রয়েছে। তারা যদি প্রশ্ন তোলেন, কিছুটা বিতর্কিত হন, তবে তরুণদের সাহস বাড়ে। তবে ওই মহাপুরুষেরা পালন করেছেন ক্ষতিকর ভূমিকা; তারা গৃহীত অপসিদ্ধান্তগুলোকে আউড়ে যাচ্ছেন মঞ্চ থেকে মঞ্চে, বন্ধ করে দিচ্ছেন তরুণদের সাহসী হওয়ার পথ। তাই মুখোশপরা মহাপুরুষদের হাত থেকে মুক্তি প্রয়োজন। বাতিল ক'রে দিতে হবে তাঁদের। তারা ব্যস্ত থাকুন নানা প্রতিষ্ঠান ও সুযোগের সেবায়; আর দেখা দিক বিতর্কিত প্রতিভাবানেরা। স্বার্থ সত্য ও প্রতিভার বড়ো শত্রু। স্বার্থ বিপ্লবীকে ক্লীবে ও সিংহকে গাধায় পরিণত করে। ক্লীব ও গর্দভপর্বের পর বাঙলায় দেখা দিক বিতর্কিতরা, যারা আক্রান্ত হবে, কিন্তু ভ্রষ্ট হবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দান্তের দোজখ?

কবি দান্তের দোজখ খুব বিখ্যাত, এমন সুপরিকল্পিত শোচনীয় এলাকা আর পাওয়া যাবে না। উত্তর গোলার্ধের মাটির নিচে অবস্থিত দান্তের দোজখ, একটি বিশাল চোঙের মতো আকৃতি তার, যার নিচের দিকটা ক্রমশ সরু হয়ে পৌঁছে গেছে পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দুতে। ওই দোজখকে চব্বিশটি বৃত্তাকার স্তরে ভাগ ক'রে তিনি শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন পাপীদের। পাপী অনেক; তবে পাপের পরিমাণ বেশি নয়। দান্তের কাছে পাপ মাত্র তিন রকম। প্রথম পাপ হচ্ছে অদম্য ক্ষুধা বা লিপ্সা; তাঁর দ্বিতীয় পাপ বিকৃত ক্ষুধা বা সন্ত্রাস; আর তৃতীয় পাপ হচ্ছে প্রতারণা। পাপগুলোকে আজকের মানদণ্ডে পাপের মতো লাগছে না; পুণ্য ব'লেই মনে হ'তে পারে অনেকের কাছে। দান্তের পাপীরাও বিখ্যাত। তিনি বহু অমরকে স্থান দিয়েছেন দোজখে। তাদের জন্যে শাস্তির যে-ব্যবস্থা করেছেন, তা রোমহর্ষক। শাস্তি উদ্ভাবনের জন্যে মহাকবির কল্পনা প্রতিভার সাহায্য নিতে হয়েছে দান্তেকে; এমন সব শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন, যার বিবরণ প'ড়ে শিউরে উঠতে হয়। তবে আজকাল অনেকে শিউরে উঠতে নাও পারে। বিশেষ ক'রে আমাদের পক্ষে শিউরে ওঠা সহজ নয়। আমরা যে-সময়ে ও দেশে রয়েছি, সেখানে ওসব দণ্ডকে কঠোর মনে না হওয়ারই কথা। দান্তে তিন মুখের কুকুরের ব্যবস্থা করেছেন, ফুটন্ত রক্তের নদী বইয়ে দিয়েছেন, পাপীদের পাথরচাপা দিয়েছেন। তিনি এমন অনেক পাপের কথা বলেছেন, যেগুলোকে আজকাল প্রতিভা ব'লেই মনে হ'তে পারে।

বাঙলাদেশে বাস ক'রে কি বার বার দান্তের দোজখের কথা মনে পড়ে না? মনে কি হয় না যে দোজখেই বাস করছি আমরা, প্রতিদিন ভোগ করছি দোজখের যন্ত্রণা, যা দান্তের পাপীরাও ভোগ করে নি? ছেলেবেলায় বাঙলা নামের একটি 'সব পেয়েছি'র দেশের রূপকথা শুনেছি। গলাভরা গান আর গোলাভরা ধানের কিংবদন্তি শুনেছি। একটি স্বর্গ কি ক'রে দোজখে পরিণত করতে হয়, তা আমরা দেখিয়েছি। এখন এমন কোনো অভাব নেই, যা এখানে নেই। এমন কোনো দুর্ঘটনা নেই, যা আমরা ঘটাই না। এমন কোনো পাপ নেই, যা আমরা করি না। এমন কোনো অপরাধ নেই, যা আমরা প্রতিদিন সম্পন্ন করি না। দান্তের দোজখে ওই সব অপরাধ নেই, পাপ নেই, দুর্ঘটনা নেই। গত এক দশকে আমরা এসবের এমন বিকাশ ঘটিয়েছি যে আমাদের ভূখণ্ডটি যে-কোনো নরকতত্ত্ববিদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় ব'লে বিবেচিত হবে। আমাদের 'স্বাধীন ও সত্যভাষী' পত্রিকাগুলোতে সব সংবাদ প্রকাশ পায় না। কিন্তু প্রতিদিন স্তম্ভে স্তম্ভে যেটুকু মুদ্রিত হয়, তাই যে কোনো মানুষকে পাগল করার জন্য যথেষ্ট। এখন সুস্থ মানুষ পাওয়াও ভাগ্যের কথা। আমরা যে একে অপরকে কথায় কথায় পাগল বলি, এটা হয়তো মিথ্যা নয়; যে-পরিবেশে বাস করছি, তাতে যদি পাগল না হই, তাহলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের মনুষ্যত্ব সম্পর্কেই সন্দেহ করতে হবে। এ-পরিবেশে যারা সুস্থ, তারা মানুষ নয়; পশুও নয়। তার চেয়েও ইতরতর কিছু।

এখানে যা কিছু ঘটতে পারে। প্রজ্বলিত রেলগাড়ি শাঁ শাঁ ক'রে ছুটতে পারে, লাফিয়ে পড়তে পারে ধানখেতে; এখানে বাস ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে নদীতে, শিশুবিদ্যালয়ে আগুন লাগিয়ে দিতে পারে মাস্তানরা, শৃঙ্খলারক্ষীরা ধর্ষণে মেতে উঠতে পারে, একটি টাকার জন্যে খুন হ'তে পারে একটি নিষ্পাপ শিশু, ছাত্রাবাস হয়ে উঠতে পারে অস্ত্রাবাস, প্রেমিক অভিসারে গিয়ে প্রেমিকাকে ধর্ষণ ক'রে খুন করতে পারে। মাত্র এক সপ্তায় সোনার বাঙলায় কী ঘটতে পারে তার এক খণ্ডাংশ যদি সংগ্রহ করি পত্রিকার পাতা থেকে, তবে অনেকেই আতংকিত হবেন। পত্রিকার পাতা থেকে কিছু শিরোনাম তুলে দিচ্ছি। 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি হল থেকে বিপুল অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার', 'সিলেটে তরুণ ব্যবসায়ী খুন', 'ধর্ষণের দায়ে পুলিশ অফিসার গ্রেফতার', 'ময়মনসিংহে দু'ব্যক্তি খুন', 'তিনটি সড়ক-দুর্ঘটনায় নিহত ৪ আহত ৩২', 'রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি হল থেকে অস্ত্র উদ্ধার', 'দু-স্ত্রী ঘরে রেখে বৃদ্ধের ষোড়শীর পাণিগ্রহণ', '১৭ বছরে সোয়া লাখ লোক আত্মহত্যা করেছে,' 'নগরীতে ডাকাতি', 'কক্সবাজার ও যশোরে সড়ক ডাকাতি', 'আদমজিতে শ্রমিকের রহস্যজনক মৃত্যু', 'বরিশালে পাঁচ সন্তানের জননী ধর্ষিত', 'বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে খুলনায় সোয়া লাখ টাকা ছিনতাই', 'মেঘনা নদীতে যাত্রীবাহী লঞ্চে দুর্ধর্ষ ডাকাতি', '২২টি সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ১৮', 'নড়াইলে এক মাসে ১৩ জনের অস্বাভাবিক মৃত্যু' 'বস্তাবন্দী তরুণের লাশ উদ্ধার' ডেমরায় ট্রাক উল্টাইয়া ৩ জন নিহত, কিশোরী এসিড দগ্ধ, কুলসুমের শ্বাসরুদ্ধ করিয়া মারা হইয়াছে, টাঙ্গাইলে হত্যার দায়ে ১ জনের মৃত্যুদণ্ড, ইঞ্জিনচালিত নৌকা দুর্ঘটনায় ২৮ জনের প্রাণহানি, নিদারাবাদের মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের দায়ে আরও একজন গ্রেফতার, রাজধানীতে পুলিশের দুটি রাইফেল ছিনতাই, এস, এস সি পরীক্ষার দুটি ভুলে ভরা মার্কশীট, 'ভিডিপি সম্পাদিকরা ওপর পৈশাচিক নির্যাতন, চাকুরির লোভ দেখিয়ে পতিতালয়ে বিক্রি, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় হত্যা; দুইজন পুলিশ অফিসার সাসপেন্ড, নারী পাচারকারীসহ ১১ জন গ্রেফতার', মেডিকেল অফিসারের বাসা থেকে রক্তমাখা প্যান্ট উদ্ধার', সাতক্ষীরায় ১৮ জন তরুণীসহ ৪৯ জন উদ্ধার, চট্টগ্রামে ব্যাগভর্তি ৩ লাখ টাকা উধাও। কয়েকদিনের কয়েকটি মাত্র শিরোনামেই দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়। সব দুর্ঘটনা ধরা পড়েনি, সব অপরাধ শিরোনাম হয় নি, সব পাপ খবরের কাগজে প্রকাশ পায় নি। প্রকাশ পেয়েছে খুবই সামান্য। পৃথিবীর কোনো দেশে এতো অপরাধ ঘটে না, আমেরিকায়ও ঘটে না এতো দুর্ঘটনা। এসব প্রকাশ্য অপরাধ-দুর্ঘটনা-পাপ আমাদের সমাজের অপরাধ-পাপের তুচ্ছ অংশ। ওপরের তলায় ওই সপ্তাহে যা ঘটেছে, তার কিছুই সংবাদপত্রে আসে নি। যদি আসতো তাহলে হয়তো পুরোপুরি পাগল হয়ে যেতে হতো। দান্তের দোজখও এতো মর্মান্তিক নয়।

এসব থেকে দুটি জিনিস খুব স্বচ্ছরূপে ভেসে ওঠে। একটি হচ্ছে রাষ্ট্রযন্ত্র পুরোপুরি বিকল; অন্যটি হচ্ছে দেশ থেকে সব রকমের নৈতিকতা বিদায় নিয়েছে। রাষ্ট্র অধিবাসীদের ভাত দিতে পারছে না, কাপড় দিতে পারছে না; এমনকি হাজার হাজার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উর্দিপরা শৃঙ্খলাবিধায়ক থাকা সত্ত্বেও দিতে পারছে না ন্যূনতম নিরাপত্তা। সড়কে নিরাপত্তা নেই, গৃহেও নেই; জলে নেই, স্থলভাগেও নেই। বিকল হয়ে পড়েছে সব কিছু। রাষ্ট্রযন্ত্র দেশবাসীকে ক'রে তুলেছে দাস্তের দোজখের অধিবাসী। নৈতিকতাও কোনো অলৌকিক ব্যাপার নয়; কোনো পুণ্যগৃহ বা গ্রন্থ থেকে নৈতিকতাও মানুষের মধ্যে সংক্রামিত হয় না। ভালোমন্দের ধারণাও সামাজিক, রাজনীতিক, রাষ্ট্রিক। রাষ্ট্রযন্ত্র বাঙলার অধিবাসীদের ভালোমন্দের বোধও নষ্ট ক'রে ফেলেছে। অথচ মৌখিক নৈতিকতার ছড়াছড়ি চারপাশে। পীরে দেশ ভ'রে গেছে, মুরিদ উপচে পড়ছে; নামাজ-রোজা-আজান-হজ সম্প্রচারিত হচ্ছে রঙিন ক'রে, কিন্তু চারপাশে অনৈতিকতা। কোনো সমাজ যখন অন্তরে অনৈতিক হয়, তখন মৌখিক নৈতিকতার বাড়াবাড়ি করে। বাঙলাদেশে এখন তাই হচ্ছে। সোনার বাঙলা বলতে এখন ঠোঁট জড়িয়ে আসে, ধান আর গানের গল্প হাস্যকর মনে হয়। শুধু দাস্তের দোজখের রূপ মনে পড়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষেরা

কবি ব্লেক আর্তনাদ করে উঠেছিলেন, হায়, আমি কেনো আমার প্রজাতির অন্যদের মতো নই। তিনি কিছুটা বেশি ভিন্ন ছিলেন অন্যদের থেকে; — তিনি এমন কিছু দেখতে পেতেন মানুষের মুখে, ফুলের পাপড়িতে, স্বর্ণমুদ্রার মতো ভোরের সূর্যে, যা দেখতে পেতেন না অন্যরা। তিনি শুনতেন এমন স্বর, যা শুনতো না অন্যরা। তিনি বাস করতেন অন্য বাস্তবতায়। তবে শুধু ব্লেক ভিন্ন বাস্তবতায় বাস করতেন না, আমরা সবাই বাস করি ব্যক্তিগত বাস্তবতায়। আমাদের বাস্তবতার মধ্যে মিল আছে, ওই বাস্তব অনেকাংশে অভিন্ন; তবে খুবই ভিন্ন অনেকাংশে। এক অখণ্ড বাস্তবতা ব'লে কিছু নেই। একই শহরে থাকছি, পোহাচ্ছি একই যন্ত্রণা, বা থাকছি একই রাস্তায়, সহ্য করছি একই পীড়ন বা ঘুমোচ্ছি একই শয্যায়, বিক্ষত হচ্ছি একই কাঁটার আঘাতে; তবুও আমরা পুরোপুরি একই বাস্তবে নই। একে অপরের মধ্যে বারধান দুস্তর। আর কোনো প্রজাতির মধ্যে সম্ভবত এমন দূরত্ব নেই। প্রতিটি পাখি সম্ভবত থাকে একই বাস্তবে, প্রতিটি পোকাও থাকে একই বাস্তবতায়, কিন্তু মানুষ ভিন্ন ভিন্ন বাস্তবতার অধিবাসী। একই ঘটনা দুজনে দেখি না একই রকমে, একই দৃশ্য সমান সুন্দর নয় দুজনের কাছে, দুজনের বিশ্ব বা মহাজগৎ কখনোই এক নয়। প্রতিটি মানুষ একেকটি বাস্তবতা। মানুষের মাথায় প্রতি মুহূর্তে কী চলছে, তা খুলে দেখা যেতো যদি, তাহলে ধরা পড়তো যে তারা কতো পৃথক। একজন হয়তো আদিম, তার হয়তো বিকাশই ঘটেনি; আরেকজন হয়তো অনাগত কালের, তার সময় এখনো আসে নি। একজন ভিখিরির কথা ধরা যাক। বারবার আমার জানতে ইচ্ছে করে তার বিশ্বটি। তার স্থূল বাস্তবটি স্পষ্ট। রাস্তার পাশে থাকে, ছেঁড়া ত্যানা পরে খেতে পায় না, ট্রাকের চাকার পাশেই ঘুমিয়ে থাকে, নরকে থাকে। তার বিশ্ব কতোটুকু। সে তো জানে না পৃথিবী গোল, জানে না এটা ঘুরছে, জানে না এটা কতো বড়ো। সে প্রায় কিছুই জানে না। সে থাকে যে-বাস্তবে, তার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক একজন শিক্ষিত মানুষের বাস্তবতা। ধার্মিকদের বাস্তবতার কথা ধরা যাক। তারা বিধাতায় বিশ্বাস করে, তাদের বিধাতারা নানা রকম : মুসলমানের বিধাতা একরকম, হিন্দুর বিধাতা আরেক রকম; খ্রিস্টানের বিধাতা আরেক রকম, ইহুদির বিধাতা আরেক রকম। বিভিন্ন ধর্মের অনুসারী হওয়ার ফলেই তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে বিভিন্ন বাস্তবতায়। ওই বাস্তবতারাশি শুধু বিভিন্ন নয়, পরস্পরবিরোধীও। একজন হয়তো কোনো তরুণীর দিকে তাকানোর সাথে সাথে কেঁপে ওঠে, কেননা তার বিধাতা তাকিয়ে আছে তার দিকে এবং এজন্যে তাকে কঠিন শাস্তি পেতে হবে। তার বিশ্বাস তাকে এক হিংস্র বাস্তবতার মধ্যে ফেলে রেখেছে। যুক্তিবাদীর কাছে ব্যাপারটি হাস্যকর। সে হয়তো বিধাতার অস্তিত্বই অস্বীকার করে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেননা অস্বীকার করার কারণের অভাব নেই; আর যদি স্বীকারও করে যে বিধাতা আছে কোনোখানে, তবুও একটি তরুণীর দিকে তাকানোটাকে শাস্তিযোগ্য মনে হবে না তার কাছে। একজনের কাছে যা স্বর্গনরকের বাস্তবতা; আরেকজনের কাছে তা কৌতুক। ধার্মিকদের বাস্তবতা যেমনি হিংস্র তেমনি সুখকর। কোনো প্রশ্নের কামড় সহ্য করতে হয় না তাদের, তারা উপভোগ করে মেনে নেয়ার ও পরকালে প্রবল ইন্দ্রিয়পরায়ণ জীবনযাপনের সুখ। মানুষ সাধারণত নিজের চোখে দেখে না, নিজে বিচার করে না; দেখে অন্যের চোখে, আর অন্যের বিচার বিশ্বাস করে। বিশ্বাস জিনিসটি মানুষকে ছুঁড়ে দেয় ভিন্ন ভিন্ন বাস্তবে। একনায়কত্বে যে-বিশ্বাস করে সে বুঝতে পারে না গণতন্ত্রের বাস্তবতা; আর গণতন্ত্রে বিশ্বাসী বুঝতে পারে না সমাজতন্ত্রের বাস্তবতা। কবির বাস্তবতা বুঝে উঠতে পারে না রাজনীতিক, আর রাজনীতিকের বাস্তবতা দুর্বোধ্য মনে হয় শিল্পীর কাছে। প্রতিটি মানুষ ভিন্ন ভিন্ন বাস্তব মাথায় নিয়ে ঘুরছে ফিরছে, মুখোমুখি হচ্ছে, শত্রুতায় জড়িত হচ্ছে, চুমো খাচ্ছে; কিন্তু থেকে যাচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন বাস্তবে। বাইরের যে-বাস্তবতা, যাতে বাস করি আমরা, তা প্রখর সত্য; তবে আরো প্রখর ভেতরের বাস্তবতা। ওই বাস্তবের কেন্দ্র মস্তিষ্ক, যা মানুষকে পরিণত করে ভিন্ন সত্তায়, ভিন্ন বিশ্বে। একেকজনের ইন্দ্রিয় একেক রকমে প্রবল। যার দৃষ্টি দৃশ্যের ভেতরে আরো কিছু দেখতে পায়, যার শ্রুতি স্বরের ভেতরে শুনতে পায় আরো কিছু, যার ত্বক অনুভব করে স্পর্শাতীত আরো কিছু, তাদের পৃথিবী বিভিন্ন। একজন কবিতায় কোনো সুখ পায় না, কবিতাকে মনে করে হাস্যকর, তার বাস্তব ও বিশ্ব এক; আরেকজন পাগল কবিতার জন্যে, কবিতাই তার চরম সুখ, তার বাস্তব আরেক রকম। একজনের বাস্তবে কোনো কবিতা নেই, আরেকজনের বাস্তবে কবিতা ছাড়া সব কিছু গৌণ। একজনের কাছে টাকাই সত্য, আরেকজনের কাছে টাকা ময়লার মতো। তারা বাস করে দু-বাস্তবে। মানুষের মগজের যতো বিকাশ ঘটে ততো বাড়ে তার বাস্তবতা বা বিশ্ব। ধর্মবিশ্বাসীদের মস্তিষ্ক সম্ভবত সবচেয়ে অবিকশিত, তাদের বিশ্বও সংকীর্ণ। স্বর্গ-নরক-আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমিত তাদের বিশ্ব, কতকগুলো পুরোনো নির্দেশ দ্বারা চালিত তাদের জীবন।

সামাজিক অবস্থা ও শিক্ষা মানুষের বাস্তবের সীমা বাড়িয়ে দেয়। ভিখিরির জীবনে ভাতই হয়তো সবচেয়ে সুন্দর, কিন্তু সচ্ছল মানুষ ভাতের সৌন্দর্যের কথা ভাবে না। যে জানে পৃথিবী ঘুরছে, কেনো ঘুরছে, আর যে জানে না, তাদের বাস্তব শুধু ভিন্নই নয়, তারা হয়তো দুই প্রজাতির প্রাণী। যে মনে করে নারীর স্থান গৃহ, তার, আর যে বিশ্বাস করে নারীপুরুষের সাম্যে, তার বাস্তবতা বিপরীত। একজন জানের পরপুরুষের দিকে তাকালে কিছু হয় না, পরলোকে তো হবেই না, এমনকি এ-লোকেও চোখেও সামান্য যন্ত্রণা হয় না, বরং মাঝে মাঝে সুখ পাওয়া যায়। তার বিশ্ব অনেক আলোকিত, অনেক মানবিক। আরেকজন জানে পরপুরুষে দিকে তাকালে চোখে উত্তপ্ত লৌহ ঢালা হবে, তার বিশ্ব অন্ধ ও অমানবিক। একজন জানে বিধাতা ব'লে কিছু নেই বা থাকলেও তাতে কিছু যায় আসে না। তার বিশ্ব উদার। আরেকজন বিশ্বাস করে বিধাতা আছে, সে প্রচণ্ড শাস্তি দেয়ার জন্যে সব সময় ব্যগ্র। তার বিশ্ব সংকীর্ণ। এই যে বিচিত্র বাস্তবতা ও বিশ্ব মানুষের সেগুলোকে যদি মোটা ভাগে ভাগ করি; এবং একটিকে বলি আলোকিত,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্যটিকে অন্ধকার; এবং আলোকিত ও অন্ধকার বাস্তবের হিশেব নিই আমাদের দেশে, তাহলে দেখতে পাবো আমাদের এখানে অন্ধকারেরই আধিক্য। আমাদের মগজগুলোতে অন্ধকার কেমন কাজ ক'রে চলছে, তা চোখে দেখার উপায় নেই; তবে আমরা যে-সব কাজ ক'রে চলছি, তা থেকেই অনুমান করতে পারি কী চলছে আমাদের মগজগুলিতে। যে-অশুভ আমরা ছড়িয়ে দিচ্ছি। সামাজিক-রাষ্ট্রিকভাবে, মিথ্যা ও অসততাকে যেভাবে ক'রে তুলছি জাতীয় ব্যাপার, প্রগতিকে বর্জন ক'রে যেভাবে ছড়িয়ে দিচ্ছি প্রতিক্রিয়াশীলতা, তা থেকে তো বোঝা যায় মাথায় চলছে অন্ধকারের প্রবল আধিপত্য। রাষ্ট্র যারা চালাচ্ছে, তাদের মাথা ভরা অন্ধকার; যারা চালাচ্ছে সমাজ, তাদের খুলি পরিপূর্ণ অন্ধকারে। দেশের অধিকাংশ মানুষ গরিব ও নিরক্ষর; তারা যে-বাহ্যবাস্তবে বাস করে, তা ভয়াবহ, আর তারা মাথায় লালন করে যে-বাস্তব, তাও হয়তো কম ভয়াবহ নয়। মাথার ভেতরে আলোকিত বিশ্ব বহন করেন, এমন মানুষ খুব কম। আলোর বৃত্তটি বাঙলায় খুবই সীমাবদ্ধ। কোটি কোটি মানুষ দেশ ভ'রে, কোটি কোটি তাদের বাস্তব। ওই বাস্তবতারাশি যদি হতো আলোকিত, তাহলে দেশ আলোকিত হয়ে উঠতো; কিন্তু তার বদলে মগজে তাদের অন্ধকার, তাই অন্ধকার বাহ্যবাস্তবেও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক সপ্তাহ

বিশ্ববিদ্যালয় খুলেছে, অবশেষে শেষ হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অশুভ অনির্দিষ্ট কাল। ছাত্রছাত্রীরা ফিরে এসেছে, ফিরে এসেছে অধিকাংশই; —তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে, চোখের ঝিলিক দেখে, কণ্ঠস্বরের ভঙ্গি শুনে বোঝা যায় ফিরে আসার জন্যে তারা ব্যাকুল ছিলো কতোটা। যেনো প্রিয় মাতৃভূমি থেকে নির্বাসিত হয়েছিলো, অনেকে দিন উদ্বাস্তুর মতো ফিরেছে বিভুঁয়ে, ছিঁড়ে গিয়েছিলো তাদের সমস্ত শেকড়, নিভে গিয়েছিলো স্বপ্ন; কিন্তু ব্যাকুল হয়ে ছিলো মাতৃভূমির জন্যে; একদিন হঠাৎ মাতৃভূমিতে ফিরে আসার অনুমতি পেয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে আসতে পারাটাই সুখ, যদিও তাদের অসুখের অভাব নেই। ঝলমল করছে বিশ্ববিদ্যালয়, চৈত্রের রোদ তাকে আরো আলোকিত ক'রে তুলেছে। এক সপ্তাহ ধ'রে তারা আবার ক্লাশ করছে, ছুটছে কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে, বারান্দাগুলো মুখর ক'রে রাখছে, ঢুকছে গ্রন্থাগারে, কেউ কেউ গিয়ে বসছে তাদের নিভৃত স্থানটিতে। কয়েক বছরে এতোটা শান্তির এক সপ্তাহ দেখি নি বিশ্ববিদ্যালয়ে। মিছিলের পর মিছিল নেই, হঠাৎ বোমা ফাটার আতংক নেই, সবাই যেনো বিশ্বাস করছে এখন কোনো অশুভ ঘটনা ঘটবে না। পরিবেশ এতো শান্ত, এতোই প্রীতিকর যে পথে পথে দাঁড়ানো পুলিশের মুখের দিকে তাকিয়েও বিরক্তি জাগে না। যদি এমন শান্তি এক সপ্তাহের না হয়ে এক শতাব্দীর জন্যে আসতো, তাহলে সুখী হতাম। ছাত্ররা (=ছাত্রছাত্রী) ফিরে এসেছে, তবে শেষ নেই তাদের সমস্যার। পড়াশুনো কেমন হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে? খুব বেশি হয় না। ছাত্রদের যতোটা জ্ঞান দেয়ার কথা ততোটা দিতে পারে না বিশ্ববিদ্যালয়; এবং জ্ঞানসৃষ্টিতে অনুপ্রাণিত তো করেই না। আমাদের পাঠ্যবস্তু সংক্ষিপ্ত, অনেকাংশে পুরোনো ও বাতিল, তাও ঠিকমতো পড়ানো হয় না। অনেক শিক্ষক ক্লাশেই যান না, বা যান অনিয়মিত; অনেকে ক্লাশে গেলেও যে পাঠ দেন, তা না দিলেই হয়তো উপকার হতো। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এদিকে চোখ দেয় না। কোনো কোনো বিভাগে পড়ানো হয় শিক্ষকদের লেখা ভুল বই, ছাত্ররা ওই সব বই পড়তে বাধ্য হয়, কেননা শিক্ষক তাঁর লেখা ভুল বইই পড়ান। যে-শিক্ষক বিষয়ই ঠিক মতো জানেন না, তিনিও বই লেখেন, আর তা অন্তর্ভুক্ত হয় পাঠ্যসূচিতে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এদিকে মনোযোগ দেয়ার নৈতিকতা নেই। ছাত্ররা একবার বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকলে আর বেরোতে পারে না। চার বছরের পড়াশুনো, যা শেষ করা সম্ভব তিন বছরেই, তা গড়িয়ে গড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ে সাত-আট বছরে, ছাত্ররা প্রবীণ থেকে প্রবীণতর হ'তে থাকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যে-কোর্স পদ্ধতি প্রবর্তন করেছে, তা পড়াশুনোকে সংকীর্ণ ক'রে দিয়েছে; পরীক্ষার ফলকে করেছে দূর থেকে দূরতর। এখন প্রথম বর্ষ অনার্স পরীক্ষা দিয়ে ফলের জন্যে ছ-মাস ব'সে থাকতে হয়, দ্বিতীয় বর্ষের পর ঘুমোতে হয় আটমাস; তৃতীয় বর্ষের পর এক বছর। ফলের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অপেক্ষায়ই কেটে যায় জীবন। এখন যারা ফিরে এসেছে বিশ্ববিদ্যালয়ে, তারা সবাই ভুগছে এ-সমস্যায়। অনেকের পরীক্ষা হয়েছে আগে, কিন্তু জানে না কখন ফল বেরোবে; অনেকের পরীক্ষার কথা ছিলো অনেক আগে, জানে না কখন দিতে পারবে ওই পরীক্ষা। রাষ্ট্র তো তাদের নিষিদ্ধ ক'রেই রেখেছে। বছরের পর বছর ধ'রে বন্ধ রেখেছে ও রাখবে সরকারি নিয়োগ, কিন্তু রাষ্ট্র মেতে আছে তোরণ নির্মাণে, শীততাপ নিয়ন্ত্রণে, বিদেশযাত্রায়। অনেক দিন পর ছ-দিন পড়াশুনো হলো বিশ্ববিদ্যালয়ে, এক আশাতীত ভাগ্যের মতো মনে হয়। বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের, এর পরিবেশ রক্ষার দায়িত্ব তাদেরই। তাদের বোঝা দরকার এখানকার পরিবেশ নষ্ট হ'লে ক্ষতি হয় শুধু তাদেরই। তারা কারা? তারা মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর সন্তান। রাষ্ট্রকে যারা শাসনশোষণ করছে, তাদের সন্তানেরা দেশে পড়ে না, থাকে না; তাই বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে শাসকশোষকদের কোনো উদ্বেগ নেই; বরং বিশ্ববিদ্যালয় নষ্ট হ'লেই তাদের লাভ। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখা, এর পরিবেশ নষ্ট ক'রে জ্ঞানচর্চা ব্যাহত করা আসলে মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালির বিরুদ্ধে এক সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। নিজেদের বিরুদ্ধে এ-ষড়যন্ত্র বাস্তবায়িত করার ভার নেবে কি তারা নিজেরাই?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জীবনে একটি নতুন পর্বও শুরু হয়েছে। এক উপাচার্য পদত্যাগ করেছেন, হয়তো তাঁকে বলা হয়েছে পদত্যাগ করতে; এবং আরেক উপাচার্য দায়িত্ব নিয়েছেন। যিনি দায়িত্ব পেয়েছেন, তাঁর ওপর শুধু নিজের সাফল্য নয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাফল্যই নির্ভর করছে অনেকখানি। তাঁর বড়ো দায়িত্ব দুটি : বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা বা স্বায়ত্তশাসন রক্ষা ও প্রসারিত করা, আর বিশ্ববিদ্যালয়কে জ্ঞানচর্চায় উদ্যোগী ক'রে তোলা। তাঁর নিয়োগ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একটি ছোটোগোত্র সংকট সৃষ্টির চেষ্টা করেছিলেন, এখন তাঁরা হয়তো নিজেদের ভুল বুঝতে পেরেছেন। ওই সংকটটুকুর সৃষ্টি উদ্যোগ না নিলে পরিবেশ আরো সুন্দর হতো। যে-অধ্যাদেশটি রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের সবার, সেটিতেও রয়ে গেছে অনেক ত্রুটি। হয়তো এর প্রণেতারা মনোযোগ দেন নি রচনার সময়, বা তাঁরা অনুকরণ করেছিলেন কোনো বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশ, তাই এখানে সেখানে খুঁত রয়ে গেছে অধ্যাদেশে। অধ্যাদেশটি ইংরেজিতে লেখা। এটিই অধ্যাদেশটির প্রধান দুর্বলতা। একটি দেশ স্বাধীন হলো, যে-স্বাধীনতার পেছনে রয়েছে দেশের ভাষাটি, ওই দেশের সংবিধান রচিত হলো রাষ্ট্রভাষায়, কিন্তু বিস্ময়কর ও লজ্জাজনক ব্যাপার হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশ রচিত হলো বিদেশি ভাষায়, ইংরেজিতে। এখনো আছে ইংরেজিতে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা যে বাঙলায় একটি অধ্যাদেশও লিখতে পারেননি—অধ্যাদেশের খসড়াটি তৈরি করেছিলেন তাঁরাই, এটা তাঁদের বড়ো ব্যর্থতা ও অগৌরব। এ-লজ্জা ও অগৌরব কি কাটিয়ে ওঠার কোনো পথ নেই? বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট আড়াই বছর ধ'রে বসে নি, বসানোর উদ্যোগও নেয়া হয় নি। রেজিস্ট্রিকৃত স্নাতকদের কেউ কেউ মামলা ক'রে স্থগিত ক'রে দিয়েছিলেন সেনেট অধিবেশন। ওই মামলাটির পেছনে কাজ করে নি শুভবুদ্ধি, অশুভবুদ্ধিই ছিলো তাতে প্রবল। আমাদের দেশে অশুভ এমনভাবেই শুভকে পর্যুদস্ত ক'রে রাখে। রেজিস্ট্রিকৃত স্নাতকদের মধ্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে সেনেটসদস্য নির্বাচনের যে-পদ্ধতি নির্দেশিত আছে অধ্যাদেশে, তা অপব্যবহার ক'রে রেজিস্ট্রিকৃত স্নাতকদের একগোত্র অধ্যাদেশকে অসম্মান করেছেন। একটি মাত্র ঠিকানায় যদি যায় হাজার হাজার ভোটপত্র, আর তা যদি পূরণ করেন কয়েকজন, নির্বাচিত করিয়ে নেন নিজেদের, তাহলে তাকে সৎ পদ্ধতি বলা যায় না। তাই প্রস্তাব করা হয়েছে সরাসরি ভোটের। এ ছাড়া অধ্যাদেশের চেতনাকে মূল্য দেয়ার কোনো উপায় নেই। এখনও আরো কোনো কোনো অংশে সংশোধিত হ'তে পারে অধ্যাদেশ, তবে ওই সংশোধনের পেছনে থাকতে হবে শুভবোধ, ষড়যন্ত্রমূলক অশুভ কোনো সংশোধন গ্রহণযোগ্য হবে না। সরকারকে পুরোপুরি হাত গুটিয়ে নিতে হবে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। পেশাগতভাবেও আকর্ষণীয় ক'রে তোলা দরকার বিশ্ববিদ্যালয়কে। পেশাগতভাবে বিশ্ববিদ্যালয় একটি নিকৃষ্ট স্থান, এখানে যোগ দেয়ার অর্থ হচ্ছে জীবন দুর্বিষহ ক'রে তোলা। পারিশ্রমিক এখানে এতো কম, সুযোগ-সুবিধা এতো সীমাবদ্ধ যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হওয়ার চেয়ে দারোগা বা শুল্কপরিদর্শক হওয়া অনেক সুবিধাজনক। এ-অবস্থা থেকে উদ্ধার করা দরকার জ্ঞানকেন্দ্রকে। সামনের কয়েকটি মাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে; এ-সময়েই আমরা বুঝতে পারবো বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে আসবে কিনা জ্ঞানের প্রশান্ত পরিবেশ, থাকবে কিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনেক দিন পর এক সপ্তাহ শান্তি পেয়েছে, তবে তার দরকার অন্তত একশতকের শান্তি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাতীয় ভাষা একাডেমি

বাঙলাদেশে কতোগুলো ভাষা আছে? এর উত্তর আমি জানি না; কেউ জানেন? সরকারি দলিলপত্র ঘেঁটেও এর কোনো উত্তর মিলবে না। বাঙলা ভাষা নিয়ে বাঙালি প্রচুর আন্দোলন করেছে, অনেক রক্ত ঢেলেছে, সৃষ্টি করেছে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র; তাই এমন ধারণা জন্মেছে আমাদের যে বাঙলাদেশে ভাষা রয়েছে একটি—বাঙলা। বাঙলা বাঙলাদেশের প্রধান, জাতীয় ও রাষ্ট্রভাষা; তবে একমাত্র ভাষা নয়, আরো ভাষা আছে দেশে। ওই ভাষাগুলো সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানি না আমরা, উৎসাহীও নই ভাষাগুলো সম্পর্কে; কেননা আমরা ওই ভাষীদের সম্পর্কেই পুরোপুরি উৎসাহহীন। আমাদের ও রাষ্ট্রের আগ্রহ থাকা দরকার ওই ভাষাগুলো সম্পর্কে। ওই ভাষাগুলো বাঙলাদেশেরই সম্পদ। বাঙলা সম্পর্কে আমাদের উৎসাহ অনেক; অবশ্য তার অনেকটাই মৌখিক ও রাজনীতিক। দু-দশকের স্বাধীনতাও পারে নি বাঙলা ভাষাকে মর্যাদা দিতে, শক্তির এলাকাগুলোতে প্রতিষ্ঠিত করতে। বাঙলা হয়ে আছে বাঙালির অবহেলিত, উপেক্ষিত, করুণ রাষ্ট্রভাষা। বাঙলা সম্পর্কেও আমরা খুবই কম জানি। বাঙলা ভাষার নিয়মকানুন শৃঙ্খলা ভালোভাবে উদঘাটিত হয় নি এখনো, নেয়া হয় নি তার শৃঙ্খলা আবিষ্কারের কোনো সুপরিকল্পিত উদ্যোগ। কিছু প্রথাগত ব্যাকরণ রয়েছে বাঙলার; এগুলো পড়ানো হয় বিদ্যালয়ে-মহাবিদ্যালয়ে; ওগুলো প'ড়ে শিক্ষার্থীরা বাঙলা ভাষা সম্পর্কে পায় নানা রকম ভুল ধারণা। উনিশ ও বিশ শতক ভ'রে ইংরেজি ও সংস্কৃত ব্যাকরণের আদলে লেখা হয়েছে ওই ব্যাকরণবইগুলো। কেউ কেউ ভালোভাবে লিখতে পেরেছেন, অনেকেই পারেননি। বাঙলাদেশে আজকাল ব্যাকরণ নামে যে-বইগুলো চলছে, সেগুলো লেখা হয়েছে আগের বইগুলো নকল ক'রে; যারা লিখেছেন, তারা বোঝেন না ভাষার শৃঙ্খলা, যারা পড়াচ্ছেন তারা বোঝেন না ভাষার শৃঙ্খলা, আর যারা পড়ছে, তাদের কাছে সবই হয়ে উঠছে বিশৃঙ্খলা। বিভিন্ন সময়ে ভাষা বিশ্লেষণ বর্ণনার বিভিন্ন রীতি দেখা দেয়, আগের রীতি বাদ দিয়ে নতুন রীতিতে বিশ্লেষণ করা হয় ভাষা। এর ফলে ভাষার অনেক অজানা বৈশিষ্ট্য উদঘাটিত হয়, যা আগে জানা হয়েছিলো এলোমেলোভাবে, তা হয়ে ওঠে পরিচ্ছন্ন। পৃথিবীর প্রধান ভাষাগুলো বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রীতিতে বর্ণনাবিশ্লেষণ করা হয়েছে, কিন্তু বাঙলা ভাষা সেভাবে বিশ্লেষণবর্ণনা করা হয় নি। বাঙলা বাষার ইতিহাস কিছুটা রচিত হয়েছে, একটি বড়ো বই লেখা হয়েছে এ-সম্বন্ধে; এতে আমাদের ধারণা হয়েছে যে বাঙলা ভাষার ইতিহাস লেখা হয়ে গেছে, আর লেখার কিছু নেই। কিন্তু নানা পদ্ধতিতে নানা দিক থেকে লেখা হ'তে পারে বাঙলা ভাষার ইতিহাস, এবং সেভাবেই লেখা হ'লেই শুধু এর বিবর্তন সম্পর্কে পৌঁছোতে পারি মোটামুটি স্পষ্ট ধারণায়। বিশ শতকে ভাষা বিশ্লেষণ যে-রীতিগুলো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখা দিয়েছে পশ্চিমে, সেগুলো খুবই কম প্রয়োগ হয়েছে বাঙলা বিশ্লেষণবর্ণনায়। কিছু খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ, কখনো কখনো ভুলেপূর্ণ সন্দর্ভ লেখা হয়েছে বাঙলা ভাষার কোনো কোনো এলাকা নিয়ে; আর সেগুলো কোনো প্রভাব ফেলেনি। অক্সফোর্ড ইংরেজি অভিধানের মতো একটি অভিধান রচনার উদ্যোগ নেয়া উচিত ছিলো অনেক আগেই, কিন্তু কখনো হয়তো নেয়া হবে না। বাঙলা ভাষার একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ রচিত হওয়া উচিত ছিলো এরই মধ্যে, কিন্তু ভাষামুখরদের কারো মনে তার ধারণাও নেই। বাঙলা উপভাষাগুলো সম্পর্কে এখনো সেটুকুই জানি, প্রায় এক শতক আগে যেটুকু জানিয়ে গেছেন জর্জ গ্রিয়ারসন। তাই আমরা বাঙলা সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানি না, বাঙলাদেশের ভাষাগুলো সম্পর্কে কিছুই জানি না; কিন্তু জানা দরকার। একটি জাতি শুধু কোলাহলে সারা জীবন কাটিয়ে দিতে পারে না।

বাঙলা ও বাঙলাদেশের বিভিন্ন ভাষা সম্পর্কে বিচিত্র গবেষণা হওয়া দরকার। এ-গবেষণার জন্যে প্রয়োজন বহু ভাষাবিজ্ঞানী। ভাষাবিজ্ঞানীর অভাব রয়েছে বাঙলাদেশে, তাই নেয়া দরকার ভাষাবিজ্ঞানী সৃষ্টির উদ্যোগ। ভাষা-গবেষণা ও ভাষাবিজ্ঞানী সৃষ্টির জন্যে প্রয়োজন একটি ভাষাসংস্থা বা একাডেমি। এখনকার কোনো একাডেমি বা সংস্থাই এ-কাজের উপযুক্ত নয়। বাঙলাদেশের সমস্ত একাডেমি ও ইনস্টিটিউট পরিণত হয়েছে স্বপ্ন ও পরিকল্পনাহীন জ্ঞানবিরোধীদের আখড়ায়, ওগুলো এখন বুড়ো জীর্ণ গর্দভের মতোই ক্লান্ত। এখনকার কোনো সংস্থার পক্ষে এ-দায়িত্ব নেয় সম্ভব নয়। এখন দরকার একটি সংস্থা বা একাডেমি, যার নাম হতে পারে 'জাতীয় ভাষা একাডেমি'। এটা 'বাঙলা ভাষা একাডেমি' হবে না, হবে জাতীয় ভাষা একাডেমি, যার দায়িত্ব হবে দেশের সমস্ত ভাষা সম্পর্কে গবেষণা চালানো। এমন এটি একাডেমি খুব অসম্ভব ব্যাপার নয়, অর্থও যে বড়ো সমস্যা হবে, তাও নয়। গরিব বাঙলাদেশে অপচয়ের কোনো শেষ নেই;—এখানে তোরণ সাজাতে যে-পরিমাণ অর্থের অপচয় ঘটে, তার চেয়েও হয়তো কম টাকা লাগবে এমন একটি একাডেমির জন্যে। এ-সরকার সৃষ্টি করবে এমন একটি একাডেমি? তাও বিস্ময়কর নয়, কেননা এ-সরকারের মাথায় ঢুকিয়ে দিতে পারা গেলে এটি মেতে ওঠে যাচ্ছেতাই নিয়ে। তবে এর কাছে জাতীয় ভাষা একাডেমি আমি আশা করি না, কেননা শুরুতেই সরকার সেটা নষ্ট করবে। অযোগ্য অনুগতরা ছুটতে থাকবে পদ ও গাড়ির জন্যে, ফুলের মালা হাতে তোরণ বানিয়ে অপেক্ষা করবে প্রভুর আগমনের, গবেষণার কাজ কিছুই হবে না। আমাদের একটি একাডেমি আছে, আমলার পর আমলা ও ব্যর্থ আমলারা সেটিকে পুরোপুরি নাশ করেছে। তার কোনো মগজ নেই, কোনো স্বপ্ন নেই। আরো একটি পঙ্গু একাডেমি বা গোবর উন্নয়ন সংস্থা জন্ম নিক, এটা আমার কাম্য নয়; আমি ভাবছি এমন একটি সংস্থার কথা, যা হবে পুরোপুরি জ্ঞানমনস্ক। ওই একাডেমি কে সৃষ্টি করবে? সরকার করবে না, করলে তা একাডেমি হবে না। তাই বাঙালি জাতিকেই সৃষ্টি করতে হবে ওই জাতীয় ভাষা একাডেমি এমন একটি সংস্থা ছাড়া আজ কোনো বড়ো কাজ অসম্ভব। বাঙলা ভাষার একটি ব্যাপক ব্যাকরণ যদি রচনা করতে চাই, যদি বিশ্লেষণ বর্ণনা করতে চাই বাঙলা ভাষায় ধ্বনি, শব্দ, বাক্য ও অর্থ, তবে সে-কাজ কারো একার পক্ষে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অসম্ভব। বাঙলা ভাষার একটি ব্যাপক বিশ্বস্ত অভিধান রচনা করতে গেলে দরকার পড়বে বহু অভিধানবিদ ও দীর্ঘ সময়ের। উপভাষাগুলো জরিপ করতে গেলে লাগবে দীর্ঘ সময় ও উপভাষাবিদ। বাঙলা ভাষার সামাজিক ব্যাকরণ রচনা করতে গেলেও দীর্ঘ সময় ও বহু ভাষাবিজ্ঞানী লাগবে। আর এমন নয় যে ভাষাবিষয়ক কাজ কয়েক দশক করলে শেষ হবে সব কাজ; এবং তখন বিশ্রাম নেয়া যাবে। জ্ঞানের সব শাখার মতো ভাষা শাখার কাজও অন্তহীন ও ধারাবাহিক। এখনকার গবেষকেরা করবেন এখনকার কাজ, একুশ শতকের গবেষকেরা করবেন একুশ শতকের কাজ, পরের শতকগুলোর গবেষকেরা করবেন তাদের সময়ের কাজ। ওই কাজ শুরু করার গৌরব অর্জনের সুযোগ রয়েছে আমাদের। ভবিষ্যতে এমন একাডেমি অবশ্যই হবে, বিশ শতকের বিপথগামী বাঙালি যদি তা সৃষ্টি করতে না পারে, তবে অবশ্যই পারবে একুশের বাঙালি। জাতীয় ভাষা একাডেমির একটি বড়ো কাজ হবে অ-বাঙলা ভাষাগুলোর পরিচয় তুলে ধরা। এই ভাষাগুলো এ-অঞ্চলে অবহেলিত ভাষাগুচ্ছ, কিন্তু সেগুলোর মূল্য কোনো রকমেই কম নয়। ওই একাডেমি যে-জ্ঞানের বিকাশ ঘটাবে আমাদের, তাই নয়, বাঙলাদেশের বিভিন্ন জাতিকে ক'রে তুলবে ঘনিষ্ঠ, কেননা তখন আমরা পরিচয় পাবো পরস্পরের ভাষার, বুঝতে পারবো একে অন্যকে। একটি ছোটো দেশে আমরা বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন ভাষা দ্বারা বিচ্ছিন্ন। ওই একাডেমি এ-বিচ্ছিন্নতা দূর ক'রে মেলাবে সকলকে। যদি বাঙলা ভাষাকে আমরা ভালোবাসি, যদি এ-ভালোবাসা আমাদের কপট কোলাহল না হয়, তবে জাতীয় ভাষা একাডেমির সূচনা করা দরকার এখনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহিত্য পত্রিকাহীন সাহিত্য

এককালে কবিদের সাথে সরাসরি সম্পর্ক ছিলো কবিতা উপভোগীদের; কবিরা কবিতা আবৃত্তি ও অভিনয় করতেন, তাঁদের ঘিরে বসতো পিপাসু শ্রোতারা, কবিদের বুক আর কণ্ঠ থেকে শ্রোতাদের শ্রুতি ও হৃদয়ে সরাসরি ঢুকতো কবিতা। একটি মঞ্চ ছিলো কবিদের, যেখানেই দাঁড়াতেন তাঁরা সে জায়গাটিই হয়ে উঠতো মঞ্চ। ওই মঞ্চ ছিলো তাঁদের আত্মপ্রকাশের ভূমি। সে-সরাসরি সম্পর্কের সরল সময় আর নেই; আধুনিক যুগ এসে সব কিছুকে পরোক্ষ ক'রে তুলেছে। আধুনিক কালে লেখকদের মঞ্চ সাহিত্যপত্রিকা, একে সেতুও বলা যায় পাঠকের কাছে পৌঁছানোর। আধুনিক সাহিত্য প্রথম মঞ্চস্থ হয় সাহিত্য পত্রিকায়। আধুনিক সাহিত্য মঞ্চটিকে বদলে দিয়েছে, আর মঞ্চ বদলে দিয়েছে সাহিত্যকে। সাহিত্য পত্রিকা ছাড়া সাহিত্য প্রকাশ মঞ্চ ছাড়া নাট্যাভিনয়ের মতো। আধুনিক কালে সরাসরি পাঠকের কাছে পৌঁছানোর উপায় নেই। যেগুলো আছে, সেগুলো বিকল্প উপায়; সেগুলো মূল উপায়ের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, সহায়ক। আধুনিক সময়ের সাথে সাহিত্য পত্রিকার ও তার সাথে উপন্যাসের সম্পর্ক এতোই গভীর যে সাহিত্যপত্রিকা না বেরোলে উপন্যাসের জন্মই হতো না। রচিত হতো না দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর উপন্যাস। লেখক ও উপভোগীর যে-সম্পর্ক নষ্ট হয়ে গেছে, তাকে বাঁচিয়ে রাখছে সাপ্তাহিক বা মাসিক সাহিত্যপত্রিকা। লেখক প্রথমেই বই আকারে বেরোতে চান না, এ-সময়ও চায় না যে লেখক প্রথমেই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হোক, পাঠকও চায় না। তাই সাহিত্যপত্রিকা ছাড়া সাহিত্য এখন কল্পনা করা যায় না, তবে বাঙলাদেশে অকল্পনীয় ব্যাপারটিই পুরোপুরি বাস্তব। বাঙলাদেশ, সম্ভবত, একমাত্র দেশ যেখানে সাহিত্য আছে কিন্তু সাহিত্যপত্রিকাই নেই; যেগুলো আছে সেগুলোকে সাহিত্যপত্রিকা বলা অতিশয়োক্তি। কিছু সাপ্তাহিক রয়েছে এখানে, সেগুলো নাম মাত্র সাহিত্য প্রকাশ করে; উপকারের থেকে বেশি অপকার করে সাহিত্যের। ঈদসংখ্যাই ওসব সাপ্তাহিকের সাহিত্যের পরম পরিণতি। দু-একটি ত্রৈমাসিক রয়েছে, যেগুলোকে মনে হয় বুড়োদের লিটল ম্যাগাজিন—যেমন ক্লান্ত, তেমনি মুমূর্ষু; ধুঁকে ধুঁকে বেঁচে আছে ব'লে পুরোপুরি মরে না, তবে ওগুলোর বাঁচা মৃত্যুর থেকেও মর্মান্তিক। এ-সুযোগে সাহিত্যকে শুশ্রূষা ও শোষণ করে চলছে দৈনিক পত্রিকাগুলো, যেগুলোতে সাহিত্যের একটি পাতা থাকে, পাতা নিয়ে দলাদলি হয়; কিন্তু সাহিত্য যা হয় তা শোচনীয়। একজন ভালো লেখক দৈনিক পত্রিকার নিউজপ্রিন্টের প্রকাশের কথা ভাবতে পারেন না, কিন্তু এখানে দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হতে পারলেও পরিতৃপ্তি বোধ করতে হয়। দৈনিক সাহিত্যের জন্যে কিশোর পাঠকের আগ্রহ থাকতে পারে, প্রকৃত পাঠকের থাকতে পারে না; কারণ ওগুলো কোনো আগ্রহ বা রুচি সৃষ্টি করে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দৈনিকে সাহিত্য গৌণ, সংবাদ মুখ্য। ওই সাহিত্য যেমন পাঠককে সাহায্য করে না উপভোগে, তেমনি লেখককে অনুপ্রাণিত করে না সৃষ্টিতে। সাহিত্যপত্রিকার অর্থ হচ্ছে তা নিয়মিত হবে, বিশেষ সময়ে তাকে পাওয়া যাবে, তার চরিত্র থাকবে, তা প্রথাগত সাহিত্যের সাথে নতুন সাহিত্য বিকশিত করবে। জাতি হিসেবে বাঙালি এখন বন্ধ্যা, তার কোনো সৃষ্টিশীলতা নেই; —সাহিত্যপত্রিকার অভাব এ-দিকটি যেমন স্পষ্ট নির্দেশ করে, অন্য আর কিছু বোধ হয় এতোটা করে না।

সাহিত্যপত্রিকা নেই ব'লেই বাঙলাদেশে সাহিত্য এখন একটা বিশেষ ঋতুর পণ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাহিত্যপত্রিকা থেকে লেখক আত্মপ্রকাশ করেন গ্রন্থাকারে, তা হওয়া স্বাভাবিক বছরের যে-কোনো সময়ে। কিন্তু এখানে উপন্যাস হয়ে উঠেছে ঈদের ও ফেব্রুয়ারির পণ্য;—এক উৎসবের চাপে ওগুলো লেখা হয়, আরেক উৎসবের তাড়ায় ওগুলো বই হয়ে বেরোয়। চাপে ও তাড়ায় ওগুলো কৃশ থেকে কৃশতর হচ্ছে, ঈদ ওগুলোকে নিউজপ্রিন্টের পঁচিশ-ত্রিশের বেশি পাতা দিতে পারে না, লেখকেরাও তার বেশি পারেন না আর একুশের উৎসবে ওগুলো কোনোরূপে সত্তর-আশি পাতার রূপ ধরে। সাহিত্যচর্চা এখানে খণ্ডকালীন কাজ, বই প্রকাশও ফেব্রুয়ারির কর্ম; ফেব্রুয়ারি এখন গুটিকয় 'অপন্যাস' উপহার দিয়ে নিজেকে ধন্য বোধ করে। দেশে প্রকৃত প্রবন্ধ দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে। সাহিত্য, ও অন্য কোনো বিষয়ক চিন্তামূলক প্রবন্ধ এখানে চোখে পড়ে না; অপরাজনীতিক সাংবাদিকতা পরিচিত হয়েছে প্রবন্ধ নামে। গত কয়েক বছরে এমন কোনো প্রবন্ধ বা প্রবন্ধগ্রন্থ পড়ি নি যা একটু ভাবতে উৎসাহিত করে। তথাকথিত প্রবন্ধের বই বেশ বেরোয়, তবে তার অধিকাংশই অপসাংবাদিকতা বা অপগবেষণা। কবিতা এখন বড়ো বেশি অসুস্থ। দৈনিক বা বুড়োদের লিটল ম্যাগাজিনের কবিতা প'ড়ে মনে হয় বাঙলা ভাষা সম্ভবত আর কবিতা লেখার উপযোগী নয়। ভাষার সমস্ত সজীবতা নষ্ট করা হয়ে গেছে, প্রতিটি শব্দ ফ্যাকাশে হয়ে পড়েছে, কামনাবাসনা, আবেগ বা স্বপ্ন, বা বিশ্বাসঅবিশ্বাস, চিৎকার ও চুম্বন সবই গুয়োরের মাংস হয়ে উঠেছে। রাজনীতিক সামাজিক কারণ রয়েছে এর পেছনে, এবং রয়েছে শিল্পবোধশূন্যতা, যা জন্মেছে সাহিত্যপত্রিকার অভাব থেকে। সাহিত্যপত্রিকা পরিবেশ সৃষ্টি করে শিল্পের, তা ভাবায়, আলোড়িত করে, দিক নির্দেশ করে। বই পাঠকের কাছে পৌঁছাতে সময় নেয়, গৃহীত হয় দেরিতে—বিশেষ ক'রে আমাদের সমাজে, কিন্তু সাহিত্যপত্রিকা সপ্তাহে বা মাসে বা ঋতু ঋতুতে এসে সজাগ ক'রে তোলে, ও সজাগ থাকতে বাধ্য করে। সাহিত্যপত্রিকা মানদণ্ডের মতোও কাজ করে। লেখকেরা ওই পত্রিকার মান অর্জনের ও অতিক্রমের সাধনার প্রেরণাবোধ করেন সব সময়। এখানে সাহিত্যপত্রিকা নেই, কিন্তু উপসংস্কৃতির পত্রিকায় রাস্তা আবর্জনাপূর্ণ হয়ে আছে। সাহিত্যপত্রিকা নির্দেশ করে সংস্কৃতির, সাহিত্যের প্রধান রূপটিকে, উপসংস্কৃতির পত্রিকা প্রচার করে উপরূপটি। সাহিত্যপত্রিকা না থাকার পরিণাম হচ্ছে উপসংস্কৃতির ধারাটির প্রধান সংস্কৃতির ধারা হয়ে ওঠা; বাঙলাদেশে তাই হচ্ছে। এক তরুণী চিকিৎসক, যে ছাত্রী হিসেবে মেধাবী ছিলো, লিখতোও ভালো, আমাকে সম্প্রতি বলেছে যে এখন সে 'দেশ'-এর মতো আধা লঘু আধা গুরু পত্রিকা প'ড়েও বুঝতে পারে না, এমনকি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়তেও ভয় পায়। সাহিত্যপত্রিকা না থাকায়, ও উপসংস্কৃতি পত্রিকা বেশি থাকায়, সে খাদ্য হয়ে পড়েছে উপসংস্কৃতির। কেলেংকারির বিবরণ সে উপভোগ করে, কিন্তু সাহিত্য ও চিন্তা তাকে পীড়িত করে। সাহিত্যপত্রিকা শুধু সাহিত্য প্রকাশ করে না, গোপনে গোপনে তা সাহিত্য সৃষ্টি করে। সৃষ্টি কোনো স্বতঃস্ফূর্ত ব্যাপার নয়, হ'লেও পুরোপুরি নয়, পেছনে যদি উদ্দীপক থাকে তাহলে সাড়া না দিয়ে পারা যায় না। অনেক কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস—পৃথিবী জুড়ে—লেখাই হতো না, যদি না উদ্দীপক হিসেবে কাজ করতো সাহিত্যপত্রিকা। রবীন্দ্ররচনাবলির অধিকাংশ জন্মেছে সাহিত্যপত্রিকার পীড়নে বা প্রেরণায় : যদি সম্পাদকেরা তাকে পীড়িত না করতেন, তাহলে ওই মহাসৃষ্টিশীল প্রতিভাও বন্ধ্যা অবসর কাটাতেন, মন নিষ্ক্রিয় থাকতো, টেবিলে থাকতো শূন্যপৃষ্ঠা। মন পুরোপুরি শূন্য, মনে হচ্ছে সেখানে কিছুই জন্ম নেবে না। এমনকি আগাছাও নয়, এমন সময় সম্পাদকের কাছ থেকে চাপ এলো, কিছুটা বিবশ সময় কাটানোর পর দেখা গেলো মনে চাষ শুরু হয়ে গেছে, কে যেনো বীজ ছড়াচ্ছে, চারা মাথা তুলছে, ফসলে জমি ভ'রে গেছে। ফসল ফললো কাগজের সাদা জমিতে। সাহিত্যপত্রিকা তা পৌঁছে দিলো গন্তব্যে। আধুনিক মহৎ সাহিত্যের বড়ো অংশ জন্মেছে সাহিত্যপত্রিকার ডাকে সাড়া দিতে গিয়ে। বাঙলাদেশে লেখকেরা বন্ধ্যাত্বে ভোগেন, সাহিত্যপত্রিকা তাঁদের ডাক দেয় না ব'লে। সাহিত্যপত্রিকা, সাহিত্যের অনুপ্রেরক ও মঞ্চ, আমাদের নেই। তাই সাহিত্য আছে, এটা বড়ো বিস্ময়। তবে ওই সাহিত্যের সামান্যই সাহিত্য, বড়ো অংশই সাহিত্যের ছদ্মবেশ বা ছদ্মরূপ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বইয়ের দোকানে

ঢাকা শহরে—নিউমার্কেট, স্টেডিয়াম, বা অন্য কোথাও-কোনো ভালো বইয়ের দোকানে যখন ঢুকি, বড়ো বিব্রত বড়ো অস্বস্তি বোধ করি। মনে হয় ছাড়পত্র ছাড়া ঢুকে পড়েছি কোনো ভিন্ন দেশে, এসে পড়েছি তাদের বইপাড়ার ঝকঝকে বইয়ের দোকানে। চারদিকে তাক, মেঝে ও অন্যান্য বন্দোবস্ত জুড়ে—ভিডিও ক্যাসেটের মতো সাজানো রঙবেরঙের বই : যেদিকে তাকাই দেখি থরেথরে সাজানো কলকাতা। ওই রঙিন, আবেদনজাগানো, আমদানি করা পণ্যের মধ্যে আমার বিপন্ন চোখ খুঁজতে থাকে দেশি বই, যা সাধারণত চোখে পড়ে না। ভয়ে ভয়ে খুঁজি বাঙলাদেশের বই, আতংকে থাকি এই বুঝি চোখে পড়ে যাবে বাঙলাদেশের বই, এবং লজ্জায় কালো হয়ে যাবো। দেশি বই চোখে না পড়লেই সুস্থ বোধ করি। যখন হঠাৎ দেখতে পাই দোকানের এক কোণে ছোটো তাকে অবহেলায় প'ড়ে আছে কয়েকটি দেশি বই—গরিব, রঙচটা, উপেক্ষিত, তখন রক্তে চাপ বোধ করি; অসহায় লাগে, অপমানিত বোধ করি অনেকটা। ওই সব বইয়ের দোকানে আমার কোনো বই দেখি না; একে আমি স্বাভাবিক ব'লেই মনে করি; কিন্তু যাদের বই বেশ বিক্রি হয়, তাদের বইও দেখা যায় না ওইসব আমদানিমত্ত দোকানগুলোতে। কলকাতার বইয়ে আমাদের ডলারসম্পন্ন বইয়ের দোকানগুলো প্লাবিত হয়ে আছে; ওই বন্যায় ভেসে গেছে বাঙলাদেশ ও বাঙলাদেশের বই। কলকাতা কি এখনো আমাদের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র? কলকাতায় অনেক বই বেরিয়েছে, বিজ্ঞাপনের উচ্চকণ্ঠ আবেদনে সেগুলোর নাম আমি জানি, কিন্তু ওইসব বই আমি হয়তো কখনো পড়বো না। কলকাতা এখনো আমাদের চোখে উঁচু পর্বতের মতো; আমরা যেনো মনে করি ওই পর্বতে জমবে মূল্যবান তুষার, আর আমরা ভাসবো ওই তুষারগলা ঢলে। পশ্চিম বাঙলার গৌণ লেখদের নামও আমি জানি, তাদের আমরা গণ্য করি প্রধান ব'লে; তাদের বই হাতে পেলে ধন্য হই। এটা আমরা বুঝি না যে কলকাতায় সৃষ্টিশীলতা ও মেধা এখন পুরোপুরি পণ্যে পরিণত হয়ে গেছে; তারা সারাক্ষণ ফেরি ক'রে ফিরছেন নিজেদের মস্তিষ্ক ও হৃৎপিণ্ড। কলকাতার অধিকাংশ বইই আসলে বই নয়; ওইগুলো ব্লেড, পাউডার, শাড়ির মতোই পণ্য। কলকাতায় বই লেখা এক বড়ো পেশা, এ পেশায় জড়িত ব্যবসায়ীর সংখ্যাও কম নয়। কেউ ফেঁদে চলেছেন গল্প, কেউ উৎপাদন ক'রে চলেছেন কাব্যিক পাগলামো, কেউ করছেন বুদ্ধিব্যবসা। মুদ্রণ শিল্পের উন্নতির ফলে ওই পণ্যরাশি এখন ঝকঝকে প্রচ্ছদে বাঁধাই হয়ে বাজারে ঢুকছে; কিন্তু তাদের বাজার খুবই ছোটো। উচ্চবিত্তরা বই পড়ে না, নিম্নবিত্তরাও পড়ে না—পড়তে পারে না; তাই তাদের পুস্তকপণ্যের জন্যে দরকার বিদেশি বাজার। বাঙলাদেশ তাদের বইয়ের লোভনীয় বাজারের ভূমিকা পালন করেছে। পশ্চিম বাঙলায় এখন বাঙলা ভাষার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে-অবস্থা, তাতে একদিন সেখানে বাঙলা ভাষা টিকে থাকবে সম্ভবত শুধু সাহিত্যে, বইতে; পুরোপুরি তাঁরা নির্ভর হয়ে পড়বেন বাঙলাদেশী পাঠকদের ওপর। তাঁদের বই মাত্রই ভালো বই নয়, যদিও মুদ্রণ ও প্রচ্ছদ উন্নত। আমরা কি ওই মুদ্রণ দিয়েই মোহিত হয়ে থাকবো? আমি কোনো দেশের বইয়েরই বিরোধী নই, পড়তে চাই সব দেশের বইই; কিন্তু পশ্চিম বাঙলার পুস্তকপণ্যকে আমাদের জন্যে ক্ষতিকর ব'লে মনে করি। এখন যেভাবে অবাধে বই আমদানি করতে দেয়া হচ্ছে কলকাতা থেকে, তা আমাদের মেধা ও সৃষ্টিশীলতার বিরুদ্ধে ভয়াবহভাবে কাজ ক'রে চলছে। কলকাতার সস্তা উপন্যাস, বাজে কবিতা, ব্যবসায়িক প্রবন্ধ উপকারের চেয়ে অপকার করছে বেশি। আমাদের বই সেখানে যায় না, কিন্তু আমরা বাস করছি তাঁদের বইয়ের স্তূপের নিচে। এখন সম্ভবত কয়েক কোটি টাকার বই আসছে, এটা নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। কলকাতার বইয়ের দুর্ঘটনার সাথে যুক্ত হয়েছে আরেকটি দুর্ঘটনা, যা আমাদের সাহিত্যের জন্যে ক্ষতিকর। ষাটের দশকে আসতো প্রচুর ইংরেজি বই, যা আমাদের পরিচিত ক'রে দিতো বিশ্বসাহিত্যের সাথে; এখন পশ্চিমের বইপত্র আসে না। জানতে পাই না কী ঘটছে আধুনিক সাহিত্যের প্রধান এলাকাগুলোতে। ষাটের দশকে বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে আমাদের সাহিত্যে একটি ঢেউ এসেছিলো, এখন সে ঢেউ নেই। কেননা বিশ্বসাহিত্য থেকে বিচ্ছিন্ন আমরা।

বাংলাদেশে প্রকাশনা একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পরূপে আজো দেখা দিলো না, যদিও ভালো লেখক আছেন, এবং ভালো লেখক জন্মানোর সম্ভাবনা প্রচুর। আমাদের প্রকাশকদের অনেকে বই ব্যাপারটিই বোঝেন না, তাঁরা পুস্তক প্রকাশনাকে মনে করেন এক ধরনের কুটিরশিল্প; বোঝেন না কী বই ছাপবেন, কার বই ছাপবেন, কীভাবে ছাপবেন। তারা লেখদের সাথে কোনো চুক্তিও করেন না, সম্মানীও না দিতে পারলে দেন না। মুদ্রণ ও প্রচ্ছদের শোভনতার দিকে তাদের কোনো লক্ষ্য নেই। আমাদের বইগুলোকে বই ব'লেই মনে হয় না; —তার কাগজ অরুচিকর, ছাপা অস্বস্তিকর, বাঁধাই আদিম। হাতে নিয়ে একটুও সুখ পাওয়া যায় না। উপহারের জন্যেও যখন কেউ কেউ কিনতে যান, অনেক খুঁজেও একটি শোভন বই পান না; যেগুলো পাওয়া যায়, সেগুলো উপহার দিলে পরিবেশই নষ্ট হয়ে যাবে ব'লে ভয় হয়। তখন পাশেই পাওয়া যায় কলকাতার রঙিন বই, যা হাতে নিলে ভালো লাগে। বাঙলাদেশের লেখদের নাম জানাও কঠিন ব্যাপার, তাঁদের বইয়ের নাম জানা তো গভীর গবেষণার বিষয়। কোনো বইয়ের বিজ্ঞাপন হয় না, ভালো বইয়ের বিজ্ঞাপন একবারেই হয় না। বিনোদনমূলক কিশোরকিশোরী পাঠ্য বইয়ের কিছু বিজ্ঞাপন হয়, নানা ধরনের প্রচারও দেয়া হয় সেগুলোর; কিন্তু ভালো বইগুলো থেকে যায় চোখের আড়ালে। সাধারণত এখানে কিছু নিম্নমানের লেখক নিজেদের উৎসাহে নিজেদের বইয়ের বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকেন, তাতে তাঁদের নাম জানি আমরা; হয়তো এতে কিছু বই বিক্রিও হয়। ভালো বই আমাদের বড়ো সমস্যা নয়, সমস্যা ওই বই ভালোভাবে প্রকাশ ও বিপণন। আমাদের দেশে বই পড়েন কারা? উচ্চবিত্তরা বই পড়ে না। তাঁদের ভিসিআর আছে, ব্লুফিল্ম আছে, ব্যাংকক সিঙ্গাপুর আছে; পান ও উৎসব আছে। নিম্নবিত্তরা বই পড়ে না, অনেকে পড়তে পারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না, অনেকের কাছে বই হচ্ছে পাঠ্যবই। মধ্যবিত্তরা বই পড়ে? তারাও বিশেষ পড়ে না। এখানে বই পড়ে ছাত্রছাত্রীরা, তারাই আমাদের প্রধান পাঠকশ্রেণী। বিনোদনমূলক কিছু বই বেশ বিক্রি হয়, কেনে নবমদশম শ্রেণীর বালকবালিকারা; তারা ভারতীয় বইয়ের শিকার হয়ে ওঠার উপযুক্ত নয়। কিছু অধ্যাপক বই পড়েন, তাঁরা ভারতীয় বইয়ের শিকার। তাই বাঙলাদেশে প্রকাশিত ভালো বই অবিক্রিত থেকে যায়। একটি ভালো প্রবন্ধের বই এখানে বছরে পঞ্চাশ কপিও বিক্রি হয় না, ওই বইটি যারা পড়তে পারতেন তারা কলকাতার কোনো নিকৃষ্ট বই পড়েন। তাই আমাদের প্রকাশনা ও বিপণনের উপেক্ষিত দিকটির দিকে গভীর মনোযোগ দেয়ার সময় এসে গেছে। আমরা কি দেখতে চাই না জাতির সৃষ্টিশীলতা ও মননশীলতার বিকাশ? আমরা কি বাইরে নিম্ন সৃষ্টি ও মননশীলতা দ্বারা পর্যুদস্ত হয়ে থাকতে চাই? আমার ইচ্ছে হয় বইয়ের দোকানে স্বস্তির সাথে ঢুকি, সেখানে পাই বাঙলাদেশকে, তার হৃদয় ও মস্তিষ্ককে। ভিন্ন দেশের পাঁচ-হাত-ঘোরা হৃদয় আর মগজ নিয়ে কতোকাল আনন্দে থাকবো?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিশুরা কি পড়বে না?

ঢাকার ঘরে ঘরে এখন শিশুদের বিষণ্ন মুখ দেখা যাবে। তারা বিষণ্ন, পীড়িত, কেননা জীবনের প্রথম ব্যর্থতা তাদের দংশন করছে। এর আগে তারা অনেক কেঁদেছে, তাদের চোখে জল ঝলমল করেছে, ওই কান্না আর চোখের জল শৈশবের সোনার মতো; কিন্তু এই প্রথম তাদের চোখে দেখা দিয়েছে ব্যক্তিগত ব্যর্থতার অশ্রু। ব্যর্থতা ও সাফল্যের কোনো ধারণা ছিলো না তাদের, তারা জানতো না পৃথিবীতে আছে ব্যর্থতাসাফল্য নামক এক বাজে ব্যাপার, তবে এই প্রথম, পাঁচ বছর বয়সেই, বুঝতে পারছে এমন কিছু আছে, যাতে চোখে আপনাআপনি জল আসে, বুক থেকে ওঠে অন্য রকম কান্না। তারা বুঝতে পারছে তারা ব্যর্থ। জননী বঙ্গভূমি এভাবেই তার সন্তানদের জীবন-অভিজ্ঞ ক'রে তুলেছে। ব্যর্থতাই হয়ে উঠছে তাদের আদি অভিজ্ঞতা। ওই শিশুদের ব্যর্থতা-তারা বিদ্যালয়ে ভর্তির জন্যে পরীক্ষা দিয়েছিলো, কিন্তু ভর্তির জন্যে মনোনীত হয় নি; তারা ভর্তি হ'তে পারবে না। তারা জানে না কারা মনোনীত করে কেনো করে বা করে না, কিন্তু তারা পাঁচ বছর বয়সেই বুঝে ফেলেছে তারা ব্যর্থ। এই তারা প্রথম নিজের দায়িত্ব নিয়েছিলো, কিন্তু তা পালন করতে পারেনি। তারা অনেক রূপকথা শুনেছে, অনেক ভয়ংকর রূপকথা ঘ'টে গেছে তাদেরই জীবনে; হয়তো ভাবছে যে রূপকথার দৈত্যটিই তাদের মনোনীত করেনি। যে-বিদ্যালয়ে ভর্তির জন্যে তারা পরীক্ষা দিয়েছিলো, সেটিকে হয়তো এখন তাদের কাছে ডাইনিদের পুরী ব'লে মনে হচ্ছে; যারা পরীক্ষা নিয়েছিলো, তাদের মুখ হয়তো ব্যর্থ শিশুদের চোখে দৈত্যের বিকট মুখরূপে ভাসছে। জীবনের শুরুতেই একটি মনস্তাত্ত্বিক আঘাত পেয়েছে তারা, ওই আঘাতে যে-রক্তক্ষরণ হচ্ছে, তাতে বিষণ্ন ওই শিশুদের মুখ। তারা এখন আর আগের মতো উৎফুল্ল নয়, তারা চিৎকার ক'রে বাড়ি মাতায় না; বিছানায় শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ে না, ব্যর্থতা তাদের চোখের ঘুম শুষে নিয়েছে। শিশুরা ঠিক কী ভাবছে, আমরা জানি না; কিন্তু ব্যর্থতার কামড় যে তাদের কষ্ট দিচ্ছে, তাতে সন্দেহ নেই।

একটি করুণ হাস্যকর ব্যাপার হচ্ছে ভীতির জন্যে শিশুরা পরীক্ষা দিয়েছিলো। ওই শিশু, যে-জীবনে প্রথম ঢুকতে যাচ্ছে স্কুলে, তাকেও পরীক্ষা দিতে হয়, মনোনীত হ'তে হয়, ব্যর্থ হ'তে হয়। অনেক প্রস্তুতি নিয়েছিলো তারা; কোনো শিশুবিদ্যালয়ে এক বছর পড়েছে, ইংরেজি বাঙলা অঙ্ক শিখেছে, ছবিও আঁকতে শিখেছে; তারপর বিশেষ একটি বিদ্যালয়ে ভর্তির জন্যে পরীক্ষা দিয়েছে। তাদের পিতামাতারা দামি ফর্ম কিনেছে, পূরণ করেছে; কেউ সত্য তথ্য দিয়েছে, কেউ ভেবেচিন্তে দিয়েছে মিথ্যে তথ্য। কেউ জানে না বিদ্যালয়টি কাদের মনোনীত করবে, কী যোগ্যতা অনুসারে করবে, যোগ্যতা যাচাইয়ের কোনো মানদণ্ড আসলেই আছে কিনা? পরীক্ষায় ভালো করলেও বাদ পড়তে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারে, খারাপ করলেও বাদ পড়তে পারে, বয়স ঠিক মতো জানালেও বাদ পড়তে পারে, না জানালেও বাদ পড়তে পারে। মনোনীত করার অর্থ হচ্ছে বাদ দেয়া, স্কুলগুলো ভর্তির সময় বেশ একটা রাজকীয়ভাব নেয়; স্কুলের প্রধান শিক্ষকশিক্ষয়িত্রীরা এমন ভঙ্গি করেন যেনো অভিভাবকেরা কীটপতঙ্গ। ঢাকার স্কুলগুলোর শিক্ষকেরা এতো অভদ্র কেনো? অভিভাবকেরা প্রধান শিক্ষকশিক্ষয়িত্রীর সামান্য করুণার জন্যে ছুটতে থাকে, কিন্তু প্রধানেরা রাষ্ট্রপ্রধানের থেকেও দুষ্প্রাপ্য হয়ে ওঠেন। যে-শিশুরা মনোনীত হয়, তারা যে খুব যোগ্য আর অমনোনীতরা যে অযোগ্য এমন নয়; এক ধরনের খামখেয়ালি, আর ভেতরের নানা সূত্র, কাউকে মনোনীত আর কাউকে অমনোনীত ঘোষণা করে।

কারা কেনো মনোনীত হলো আর কারা কেনো হলো না, এটা বড়ো প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন হচ্ছে শিশুদের জীবনে প্রথম শ্রেণীটিতে ভর্তির জন্যে পরীক্ষা দিতে হবে কেনো? কেনো তাদের জীবন শুরু হবে প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে? বাদ পড়ার সম্ভাবনা মাথায় ক'রে? জীবনের শুরুতেই কি তাদের প্রমাণ করতে হবে যে তারা যোগ্য; তারা ভর্তি হওয়ায় যোগ্য, আর পড়াশুনোর অধিকার রয়েছে শুধু যোগ্যদের? প্রতিটি শিশুরই রয়েছে পড়াশুনোর অধিকার, পড়াশুনোর জন্যে তার কোনো যোগ্যতা প্রমাণের দরকার নেই। এটা তার অধিকার। এরপর হয়তো এ-সমাজে নিঃশ্বাস নেয়ার যোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে, প্রমাণ করতে হবে বেঁচে থাকার যোগ্যতা। এ প্রতিযোগিতায় দেশ ছেয়ে গেছে, অধিকাংশ প্রতিযোগিতায় সাধারণত নিকৃষ্টরাই জয়ী হচ্ছে আজকাল, আর শিক্ষাক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে মারাত্মক সংকট। প্রতিবছর কয়েক লক্ষ ছাত্র ব্যর্থ হচ্ছে মহাবিদ্যালয়ে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশে; এটা তাদের অযোগ্যতার জন্যে নয়, শিক্ষাব্যবস্থার অযোগ্যতারই জন্য। ওপরের দিকে হয়তো প্রতিযোগিতার কিছুটা দরকার আছে, কিন্তু শিশুরা স্কুলে পড়বে, সেখানেও প্রতিযোগিতা? তাহলে কি ধ'রে নেবো শিক্ষাকে আমাদের রাষ্ট্র নাগরিক অধিকার ব'লে গণ্য করে না? রাষ্ট্র কি মনে ক'রে কিছু শিশু ভর্তি হবে স্কুলে, পড়াশুনো করবে, এবং অধিকাংশ শিশু পড়াশুনো করবে না? ঢাকা শহরে যে-কটি স্কুল রয়েছে, সেগুলো খুব কমসংখ্যক শিশুরই শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারে। পাড়ায় পাড়ায় এখন শিশুবিদ্যালয় গড়ে উঠেছে, সেগুলো কিছুটা উপকার করে, কিন্তু সেগুলোতে যেহেতু ওপরের শ্রেণীতে পড়ার কোনো ব্যবস্থা নেই, তাই সেগুলো কোনো প্রকৃত উপকারেই আসছে না। রাষ্ট্র এ নিয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তিত নয়, রাষ্ট্র সমস্ত নাগরিকের অধিকার কেড়ে এখন শিশুদের মৌলিক অধিকারও কাড়তে শুরু করেছে।

যে-শিশুরা কোনো বিদ্যালয়েই স্থান পায় নি, তারা কী করবে? তাদের পিতামাতারা উদ্বিগ্ন জীবনযাপন করছে, কিছুতেই উদ্ভাবন করতে পারছে না তারা ব্যর্থ সন্তানদের সমস্যা সমাধানের। ওই শিশুরা কি ঘরে বসে থাকবে, তাদের জন্যে আমরা কি পড়াশুনো নিষিদ্ধ ক'রে দেবো? রাষ্ট্র কি পাঁচ ভাগ শিশুর পড়াশুনোর ব্যবস্থা করবে আর অবশিষ্টদের রেখে দেবে জাতীয় মূর্খ হিসেবে। ঢাকা শহরে এখন যতো স্কুল আছে, তার দশগুণ স্কুল হয়তো দরকার; ওই সমস্ত স্কুল স্থাপনের দায়িত্ব সরকারের, কিন্তু গত দশ বছরে হয়তো ঢাকা শহরে দশটি স্কুলও স্থাপিত হয় নি। এভাবেই রাষ্ট্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবহেলা করছে নাগরিকদের সমস্ত অধিকার;— তাদের খাদ্য, বাসস্থান, চিকিৎসা, চাকুরির অধিকার নেই; এবং শিশুদেরও নেই শিক্ষার অধিকার। সরকার সম্ভবত নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার পক্ষপাতী। জন্মনিয়ন্ত্রণে সরকারের অপার উৎসাহ, দু'টি সন্তানকেই সরকার যথেষ্ট মনে ক'রে, এরপর হয়তো মনে করবে যে একটি সন্তানকে পড়াশুনো করানোই যথেষ্ট। শিক্ষা মানুষের একটি মৌল অধিকার;— প্রাথমিক শিক্ষা লাভের জন্যে কোনো যোগ্যতার দরকার পড়ে না। বাঙলাদেশে কমপক্ষে ত্রিশটি বিশ্ববিদ্যালয় দরকার, সেকথা সরকারের মনে পড়ে না, যদিও বিচিত্র কুক্ষেত্রে সরকার অর্থ অপচয় করে চলছে। দেশ জুড়ে প্রতি বছর কয়েক শো স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার, কিন্তু তা কারো চিন্তায় নেই। রাষ্ট্রের চোখে শিশুরা হয়তো খুবই সামান্য, কিন্তু তারা অসামান্য, কারণ তারা আগামীকালের মানুষ। যে-সমাজ আগামী মানুষের কথা ভাবে না ভাবে শুধু নিজেদের কথা, তা বর্বর সমাজ। আমাদের সমাজের বর্বরতা খুবই স্পষ্ট। এখন ভর্তির ক্ষেত্রে যে বাছাই প্রক্রিয়া রয়েছে, তা সম্পূর্ণরূপে বর্বর। শিশুরা যোগ্যতা-অযোগ্যতার উর্ধ্বে, পৃথিবীর সব কিছুতেই রয়েছে তাদের অধিকার, আর সে-সবের মধ্যে শিক্ষা অন্যতম প্রধান। ওই ব্যর্থ বিষণ্ন শিশুদের মুখ আমি দেখতে পাই। যে-সমাজে এমন বিষণ্ন শিশুরা রয়েছে, সেখানে কারো হাসা অপরাধ; সেখানে টেলিভিশনে রাষ্ট্রব্যবস্থাপকদের হাস্যোজ্জ্বল মুখ দেখানো অপরাধ। অপরাধীরা কি শিশুদের কথা একটু ভাববে, ভাবার অবসর হবে তাদের?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যদি তুমি বাঙলায় জন্ম নিয়ে থাকো

ভাগ্য ব'লে কিছু নেই তবে একটি ক্ষেত্রে আছে, সেটি জন্মের ক্ষেত্রে। জন্মটাই একমাত্র ভাগ্য, যা জীবনটাকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শাসন করে। রাজার পুত্র হয়ে জন্ম নিলে জীবন এক রকম হয়, ভিখিরির পুত্র হয়ে জন্ম নিলে হয় পুরোপুরি উল্টো। রাজপুত্র গাধা হ'লেও মহাপুরুষ, গরিবপুত্র সিংহ হ'লেও সামান্য। রাজাকারের পুত্র হ'লে জীবন চমৎকার, মুক্তিযোদ্ধার পুত্র হ'লে দুর্বিষহ; সৎমানুষের পুত্র হ'লে জীবনটা কাঠকয়লা আর কালোবাজারির পুত্র হ'লে জীবনটা হিন্দি ছায়াছবির মতো উত্তেজক। তারপর কোন দেশে জন্ম হলো, সেটা এক বিরাট ব্যাপার। দেশটিই ঠিক ক'রে দেয় জীবনটা স্বর্গবাস হবে নাকি হবে বাস্তব নরকবাস। আমেরিকায় জন্মালে জীবন যা হয়, বাঙলাদেশে জন্মালে হয় তার বিপরীত; বিলেতে জন্মালে জীবন যা হয়, বাঙলাদেশে জন্মালে হয় তার সম্পূর্ণ উল্টো। বাংলাদেশে জন্মালে কী হয়, কেমন হয় জীবন? বাঙলাদেশে জন্মালে ধ'রে নিতে হবে জন্মের সময়ই মৃত্যু হ'তে পারে; বেঁচে থাকলে অনাহারে থাকতে হতে পারে; বাঙলাদেশে জন্মালে রোগ খুবই হবে, চিকিৎসা হবে না, হ'লেও নামমাত্র হবে; হাসপাতালে গেলে ওষুধ মিলবে না, ওগুলো হাসপাতালের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিরা গোপনে বিক্রি ক'রে দেবে; বাঙলাদেশে জন্মালে ধ'রে নিতে হবে লেখাপড়া হবে না, পরীক্ষা দিলেও অধিকাংশই পাশ করবে না, পাশ করলেও চাকুরি পাবে না। বাঙলাদেশে জন্মালে, ধ'রে নিতে হবে, জীবনটা কাটবে শক্তিমানদের খামখেয়ালির ওপর। শক্তিমানেরা চাইলে নদী শুকিয়ে ফেলা হবে, না চাইলে পথের ওপর দিয়ে নদী বইবে; শক্তিমানেরা চাইলে অসম্ভব সম্ভব হয়ে উঠবে, না চাইলে সম্ভবপর সব কিছু চিরঅসম্ভব থাকবে। শক্তিমানেরা চাইলে এখানে নিষ্পাপ দণ্ডিত হতে পারে; না চাইলে মৃত্যুদণ্ডিত মুহূর্তে নিষ্পাপ হয়ে উঠতে পারে। এখানো কোনো নিয়ম নেই, সবই চলে অনিয়মে, ও শক্তিমানদের কামনাবাসনা অনুসারে। বাঙলাদেশে জন্ম নিলে, ধ'রে নিতে হবে, জীবনটা পুরোপুরি অন্যের খেয়ালের ওপর ভর ক'রে থাকবে, পদ্মপাতায় টলমল করবে; যে-কোনো মুহূর্তে ঝরে যাবে। এখানে কোনো অধিকার নেই, কোনো যুক্তি দিয়ে এখানে কাউকে ন্যায়সঙ্গত কিছু বোঝানো যায় না। বাঙলার অধিকাংশ মানুষই যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু ক'রে উঠতে পারে না, তার কারণ গুরুত্বহীন বিষয়গুলো নিয়ে তাদের এতোই উদ্বিগ্ন থাকতে হয় যে জীবনে কিছুই ক'রে ওঠা হয় না। অন্যের স্বেচ্ছাচার ভরসা করে যাদের জীবন ধারণ করতে হয়, তাদের জীবন পশুর জীবনের থেকেও করুণ ও অসহায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগে প্রথাগত দ্বিতীয় পর্বে যে-ছাত্রছাত্রীরা ভর্তি হওয়ার অনুমতি পেয়েছিলো, এবং এখন যারা শুনছে যে তারা ভর্তি হতে পারবে না, তাদের জীবনটা এর চমৎকার উদাহরণ। তারা পত্রিকায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রিকায় যুক্তি ও আবেদনে পরিপূর্ণ চিঠি লিখছে, উপাচার্যকে 'মাননীয় উপাচার্য', 'প্রথিতযশা শিক্ষাবিদ' রূপে সম্বোধন ক'রে আকুল আবেদন জানাচ্ছে, সভাপতির কাছে করুণা প্রার্থনা করছে, সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে কলংকজনক অপরাধের সাথে জড়িত' ব'লে ধিক্কার দিচ্ছে, কিন্তু আসল কাজটি হচ্ছে না; তারা ভর্তি হ'তে পারছে না, যদিও তাদের ভর্তি হ'তে না পারার কোনো সঙ্গত কারণ নেই। তারা যে ভর্তি হ'তে পারছে না, এটা নিতান্তই শক্তিমানদের স্বেচ্ছাচার।

বাঙালি একটি সামরিক জাতি, তাই বছরে বছরে সৈন্যাবাস হচ্ছে; বাঙালি শিক্ষানুরাগী নয়, তাই এখানে নতুন কোনো বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে না। যেগুলো হচ্ছে বলে রটনা করা হচ্ছে, সেগুলো পঙ্গুবিশ্ববিদ্যালয় হবে মাত্র। অপরাজনীতি এখানে শিক্ষাকে দূষিত ক'রে ফেলেছে; অপরাজনীতিক কারণে কতকগুলো মহাবিদ্যালয়কে 'বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ' নামক একটি হাঁসজারুতে পরিণত করা হয়েছে। কিছু মহাবিদ্যালয়ে সম্মান ও এমএ শ্রেণী খোলা হয়েছে। ওসব কলেজের অধিকাংশে উচ্চমাধ্যমিক পড়ানোরও ভালো ব্যবস্থা নেই। অধিকাংশ কলেজেই যথেষ্ট শিক্ষক নেই, শিক্ষকদের পদোন্নতি নেই এবং তাদের ছুটতে হয় উচ্চমাধ্যমিক থেকে বিএ পাসে, সেখান থেকে সম্মানে, কোনো কোনো কলেজে এমএ-তে। পড়াশুনোটা কী হয়, তা সবাই বোঝে। ঢাকার কলেজগুলো তো আমলাদের ও শক্তিমানদের পত্নীদের অধ্যাপনা নামক অবসর বিনোদনের ক্ষেত্র। অধিকাংশ কলেজে সম্মান শ্রেণীতে পড়ানোর কোনো ব্যবস্থাই নেই; বই নেই, অধ্যাপক নেই; অধ্যাপকদের, সঙ্গত কারণেই, জ্ঞানঅর্জনের ও বিতরণে কোনো উৎসাহ নেই। যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেই ভাল পড়াশুনো হয় না, সেখানে কলেজে সম্মান ও এমএ শ্রেণীতে ভালো পড়াশুনো হাস্যকর দুরাশা। তবু ওই পড়াশুনো চলছে। কোনো কলেজেই এমএ শ্রেণীতে পড়ানোর সামান্য ব্যবস্থাও নেই তবুও পড়ানো হচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রতি একটি নিয়ম করেছে যে-কলেজে এমএ শ্রেণী আছে, সেখানকার ছাত্ররা সম্মান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর সেখানেই এমএ পড়বে, তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমএ পড়তে আসতে পারবে না। যে-সব কলেজে এমএ নেই, শুধু সেখানকার সম্মানিতরাই বিশ্ববিদ্যালয়ে এমএ প্রথাগত শ্রেণীতে ভর্তি হতে পারবে। নিয়মটি পুরোপুরি নীতিবিরোধী, ও বিদ্যার শত্রু। এ-নিয়মে তৃতীয় শ্রেণীতে শেষস্থান অধিকার ক'রে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার অধিকার থাকে, কিন্তু প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রথম হয়েও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার অধিকার থাকে না। কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে এলেই একটি গুণগত পরিবর্তন ঘটে; অন্তত এক বছর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া জীবনকেই বদলে দিতে পারে।

বাঙলা বিভাগে প্রথাগত দ্বিতীয় পর্বে যে-ছাত্রছাত্রীরা ভর্তি হ'তে এসে বিপদে পড়েছে, তারা বিদ্যাবিরোধী নিয়ম ও খামখেয়ালির শিকার। বিভাগ তাদের ভর্তি করার জন্যে ভর্তি পরীক্ষা নিয়েছে, ভর্তির ফর্মও দিয়েছে; তাই তাদের ভর্তি করা বিভাগ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বের মধ্যে প'ড়ে। তাদের ভর্তি করতে কোনোই অসুবিধা নেই—দ্বিতীয় পর্বে একশোটির মতো আসন রয়েছে, সেখানে নিয়মিত ভর্তি হয়েছে মাত্র তেইশজন, তাই সাতাত্তরটি আসন শূন্য প'ড়ে আছে। ওই ছাত্রছাত্রীরা শূন্য সাতাত্তরটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসনের জন্যে মেধানুসারে মনোনীত হয়েছিলো, কিন্তু হঠাৎ শক্তিমানদের কোথাও কিছু গোলমাল ঘটেছে, আর অমনি সিদ্ধান্ত হয়েছে যে ভর্তি করা হবে না। তাদের ছুটতে হচ্ছে শক্তিকেন্দ্র থেকে শক্তিকেন্দ্রে; সভাপতি থেকে উপাচার্য থেকে ডাকসু। ডাকসুরও নাকি ভর্তির ব্যাপারে মতামত রয়েছে; এতেই বোঝা যায় শিক্ষার অবস্থা কী! ওই ছাত্রছাত্রীরা আশ্বাস পেয়ে পেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাশ করছে, নিজেদের কলেজে ভর্তি হয়নি, ভর্তি হওয়ারও কোনো সুযোগই নেই আর। তারা কী করবে এখন? তাদের মাথা পেতে নিতে হবে বাঙলায় জন্ম নেয়ার জন্মগত অপরাধ? ওই ছাত্রছাত্রীরা ভর্তির আবেদন করেছিলো, ভর্তির মৌখিক পরীক্ষা দিয়েছিলো, ভর্তির ফর্ম পেয়েছিলো, সব আনুষ্ঠানিকতা শেষ করেছিলো, কিন্তু হঠাৎ কর্তৃপক্ষ জেগে উঠলে তারা ভর্তি হ'তে ব্যর্থ হয়। তাদের কোনো অপরাধ নেই, তবুও তারা শিকার; আর যারা ভর্তি পরীক্ষা দিয়েছে, ফর্ম দিয়েছে তাদের কোনো দায় নেই। একটি বছর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়লে তারা যে-মানুষ হয়ে বেরোবে, কয়েক বছর কলেজে পড়লেও তা হবে না। বিশ্ববিদ্যালয় কি বিশ্বাসঘাতকতা করবে তাদের সাথে, স্বেচ্ছাচারিতাকেই গণ্য করবে বিধি ব'লে? ওরা অধিকার অর্জন করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার, তবু যদি ভর্তি হ'তে না পারে তাহলে অপরাধী হবে বিভাগ ও বিশ্ববিদ্যালয়। ওদের কোনো অপরাধ নেই, বা একটিই অপরাধ ওদের—ওরা জন্মেছে বাঙলায়, যেখানে স্বেচ্ছাচারই সংবিধান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খোলা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ বিশ্ববিদ্যালয়

আমি, ছাব্বিশ বছর আগে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির হওয়ার কয়েক দিনের মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয় সিনে ডাই হয়ে গিয়েছিলো। সিনে ডাই, ক্যালিগুলার মতো পরাক্রান্ত শব্দযুগল, যার অর্থ অনির্দিষ্ট কালের জন্যে বন্ধ', সেই প্রথম শুনেছিলাম। বুঝেছিলাম ধ্রুপদী লাতিন ভাষা কতো সংক্ষেপে কতো দীর্ঘ কাজ করে। সে থেকে এ-শব্দ দুটি আমার জীবনে ও হৃৎপিণ্ডে ভয়ংকর স্বৈরাচারীর মতো বেঁচে আছে। ভর্তি হয়ে সবে সলিমুল্লাহ ছাত্রাবাসে ঢুকেছি, চৌকিতে উঠতে পারি নি, মেঝেই প'ড়ে আছি। অমনি একদিন এনএসএফের জমিরালিরা আমাদের ঘর থেকে তাড়া ক'রে ছাত্রাবাসের পূর্ব দিকের ছোটো দরোজা দিয়ে বের ক'রে দিলো। মোনেম খাঁ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনির্দিষ্ট কাল বন্ধ ঘোষণা করেছে, আর তা বাস্তবায়নের ভার নিয়েছে এনএসএফের মাস্তানেরা; আমরা অসহায়েরা ভয়ে ভয়ে ভালোমানুষের মতো ছাত্রাবাস থেকে বেরিয়ে এলাম। ছোটো দরোজাটির পাশে একটা নড়োবড়ো চেয়ারে বসে গৃহশিক্ষক বা হাতে ক্যাপস্টান সিগারেট ধরাতে ও টানতে লাগলেন; লাল চোখের জমিরালিরা পালন করতে লাগলো প্রচণ্ড প্রহরীর দায়িত্ব। এমএ পড়ার সময় এক সহপাঠিনীর সাথে একদিন দূরে কোথাও যাওয়ার কথা হলো, আমি অনেকগুলো নিবেদনমূলক শব্দ ও বাক্য মনে মনে সৃষ্টি ও মুখস্থ করতে থাকলাম; কিন্তু দূরে যাওয়ার আগের দিন বিশ্ববিদ্যালয় সিনে ডাই হয়ে গেলো। আমার জীবন অনির্দিষ্ট কালের জন্যে বন্ধ হয়ে গেলো। সেদিন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হৃৎরোগে মারা গেলে খুশি হতাম, পাকিস্তান দু-টুকরো হয়ে গেলে শান্তি পেতাম; কিন্তু অনেক দিন, আমার জীবনে কোনো শান্তি রইলো না। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার শেষ পরীক্ষার দিন সান্ধ্যভোজের সময়, পোলাওকোর্মার উৎসবের মধ্যে, হঠাৎ খুনোখুনি হয়ে গেলো; ছাত্রাবাস থেকে দৌড়ে বেরিয়ে গেলাম; দু-দিন পর বিশ্ববিদ্যালয় সিনে ডাই হয়ে গেলো। চট্টগ্রাম মহাবিদ্যালয় থেকে পদত্যাগ করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিতে গিয়ে দেখি ওই পাহাড়ি বিদ্যালয়ে অনির্দিষ্ট কাল ঘোষিত হয়ে গেছে। এরপর অনেক অনির্দিষ্ট কাল ভোগ ও উপভোগ করেছি; এখন চলছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনে ডাই—অনিবার্য অনির্দিষ্ট কাল; কবে ওই অনির্দিষ্ট মহাকাল শেষ হবে কেউ জানে না। আমাদের বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বন্ধের জন্যে বিশ্ববিখ্যাত; অসংখ্য বন্ধে ক্ষতবিক্ষত আমাদের শিক্ষাবর্ষ; তার ওপর রয়েছে ঋতুতে ঋতুতে অনিবার্য অনির্দিষ্ট কাল। অনির্দিষ্ট কাল ঘোষিত হয় আকস্মিক সান্ধ্য আইনের মতো—পথিক রাস্তায় রয়েছে, হঠাৎ সান্ধ্য আইন ঘোষিত হয়েছে, তাই তাকে দিগ্বিদিক ভুলে ছুটতে হয় গৃহের দিকে। সিনে ডাই ছাত্রদের জীবনে হঠাৎ ঘোষিত সান্ধ্য আইনের মতো—যে যেখানে ছিলো সেখানে থেকে তাকে ছুটতে হয় ছাত্রাবাসের দিকে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাঁথাবালিশ গুছিয়ে নিতে হয়, বেরিয়ে পড়তে হয় ছাত্রাবাস থেকে। সকালে হ'লে সকালেই বেরোতে হয় সন্ধ্যায় হ'লে বেরোতে হয় সন্ধ্যায়, মধ্যরাতে হ'লে বেরিয়ে পড়তে হয় মধ্যরাতে। যাওয়ার জায়গা না থাকলেও বেরোতে হয় পকেটে একটি কপর্দক না থাকলে ও বেরোতে হয়। সিনে ডাইর শিকার ছাত্ররা, মর্মে মর্মে তারা ভোগ করে সিনে ডাই; অন্য সবাই উপভোগ করে অনির্দিষ্ট কালের ছুটি। উপাচার্য কয়েক দিন বিশ্রাম নিয়ে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করেন, শিক্ষকেরা বাসায় ভিসিআর ও লাউঞ্জে টিভিতে ক্রিকেট দেখেন; শুধু ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত হয়ে যায়। বিশ্ববিদ্যালয় খাঁ খাঁ করতে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয় মানে খোলা বিশ্ববিদ্যালয়; বন্ধ বিশ্ববিদ্যালয় কোনো বিশ্ববিদ্যালয় নয়। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে লেখাপড়া হয় খুবই সামান্য, কোর্স খুবই সংক্ষিপ্ত তাও ঠিকমতো পড়ানো হয় না; বন্ধের পর বন্ধ ও অনির্দিষ্ট কাল আসে। বিশ্ববিদ্যালয়ের দালান সমাধিস্তূপের মতো প'ড়ে থাকে।

দুটি কারণে সাধারণত বিশ্ববিদ্যালয় সিনে ডাই হয়; [এক] ছাত্ররা যদি তীব্র সরকার বিরোধী আন্দোলন গ'ড়ে তোলে, প্রশাসনকে বিকল ক'রে দেয়; ও [দুই] ছাত্ররা যদি নিজেদের মধ্যে হানাহানিতে লিপ্ত হয়, নিজেদের হাতে খুন হয় নিজেরা। ষাটের দশকে বিশ্ববিদ্যালয় সিনে ডাই হতো প্রথম কারণে; ছাত্রদের আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠলে, মোনেমের বাহিনী অসহায় হয়ে পড়লে সরকার অনির্দিষ্ট কাল ঘোষণা করতো। ওপর থেকে চাপিয়ে দেয়া হতো অনির্দিষ্ট কাল। ছাত্রদের মধ্যে হানাহানি তখনো হতো, তবে তার চরিত্র ভিন্ন ছিলো।

এনএসএফের মাস্তানেরা মাঝে মাঝে হানাহানিতে উৎসাহ বোধ করতো, কিন্তু তখন হানাহানি সীমাবদ্ধ থাকতো ছোটো এলাকায়। এমন হতো অস্ত্রের কারণে। তখন ছোরা ও হকিস্টিকই ছিলো ছাত্রদের মারণাস্ত্র; তা খুব বড়ো রকমের ত্রাস সৃষ্টি করতে পারতো না। শুধু জড়িতরাই জড়িত হতো হানাহানিতে। এখন হানাহানিতে ব্যবহৃত হয় আগ্নেয়াস্ত্র—পিস্তল, রিভলবার, কাটা রাইফেল, মেশিনগান, বোমা। হানাহানিতে যারা জড়িত নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের আটানব্বই ভাগ ছাত্রই হয়তো জড়িত নয়, কিন্তু তারাও অনায়াসে এসে পড়ে ওই সমস্ত অস্ত্রশস্ত্রের সীমার মধ্যে। এখন আর ওপর থেকে সিনে ডাই চাপিয়ে দেয়া হয় না, সরকার বিরোধী আন্দোলনের জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে অনির্দিষ্ট কাল ঘোষিত হয় না; এখন সিনে ডাই হয় ছাত্রদের পারস্পরিক হানাহানির ফলেই। ছাত্ররা এখন লিপ্ত রয়েছে আত্মহননে, ছাত্ররা এখন নিজেরাই নিজেদের শিকার। এর চেয়ে শোচনীয়, মর্মান্তিক, বেদনাদায়ক আর কিছু হতে পারে না। নিজের ছাত্রদের লাশ দেখার জন্যে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেই নি, আমি তাদের দেখতে চেয়েছি দেবদূতের মতো সুন্দর, মেধাবী, দীর্ঘায়ু; কিন্তু এখন ফিরে ফিরে তাদেরই লাশ দেখতে হয়। আমার ছাত্ররা এখন আর মেধার জন্যে বিখ্যাত হয় না, পরিচিত হয় অপমৃত্যুর কোলে আশ্রয় নিয়ে। অনেক দিন কোনো মেধাবী ছাত্রের নাম শুনিনি, কিন্তু ঋতুতে ঋতুতে শুনছি নিহত ছাত্রদের নাম। নিহত হয়েই কি পরিচিতি অর্জন করতে হবে আমার ছাত্রদের? কিন্তু আমি নিহত ছাত্র চাই না, এমন কি শহীদ ছাত্রও চাই না; চাই প্রাণবন্ত উজ্জ্বল জীবনমুখি ছাত্র। ছাত্ররা কেনো খুন হচ্ছে পরস্পরের হাতে? এ-প্রশ্নের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছোটো উত্তর হবে রাজনীতিই তাদের খুন করছে। যে-রাজনীতি ছাত্রদের খুন করে, যে-রাজনীতি ছাত্রদের উৎসাহিত করে পরস্পরকে হননে, তা রাজনীতি নয়, দস্যুতা; দস্যুতার চেয়েও ঘৃণ্য। যারা ক্ষমতায় আছে ও যারা ক্ষমতার জন্যে উৎসাহী, তাদের সবাইকে এখন এগিয়ে আসতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ রক্ষায়। তাদের বোঝা উচিত বিশ্ববিদ্যালয়কে নষ্ট ক'রে ক্ষমতায় থাকা বা ক্ষমতায় যাওয়া আসলে নিরর্থক। ছাত্রদেরও বুঝতে হবে বিষয়টি খুব ভালোভাবে, বুঝতে হবে তারাই শিকার। যে-ই তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দিক না কেনো, ছাত্রদের বুঝতে হবে তাদের বান্ধব নয়, শত্রু। ছাত্রদের বুঝতে হবে যে অস্ত্র তারা তুলে নিচ্ছে নিজেদের হাতে, তা তাদের বিশ্বাসঘাতক সহচর। উপাচার্যদেরও বুঝতে হবে বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞানকেন্দ্র, শক্তিকেন্দ্র নয়। আমাদের উপাচার্যরা যদি পদের মোহ ভুলতে পারেন, দলাদলি ভুলতে পারেন, জ্ঞানকেই প্রধান ক'রে তুলতে পারেন, তাহলে বিশ্ববিদ্যালয় আবার পরিশুদ্ধ হয়ে উঠতে পারে। উপাচার্যরা সব কিছু নিয়েই ব্যস্ত থাকেন, শুধু লেখাপড়ার দিকটি ছাড়া। বিভিন্ন বিভাগে লেখাপড়া হয় কিনা, শিক্ষকেরা ক্লাশে যান কিনা, গবেষণা করেন কিনা এসব দিকে উপাচার্যদের লক্ষ্য নেই, কেননা তারাও তা করেন নি; বরং যে শিক্ষকেরা লেখাপড়ার সাথে সংস্রবহীন তাঁরাই অর্জন করেন উপাচার্যদের প্রীতি ও পদোন্নতি। শিক্ষা যখন নষ্ট হয়ে যায়, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিবেশ নষ্ট করার জন্যে দল বেঁধে আসে নানা উৎপাত। হানাহানি ও সিনে ডাই তার চরম রূপ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে অবিলম্বে খুলে দেয়া দরকার, মুক্তি দেয়া দরকার অনির্দিষ্টকালের গ্রাস থেকে। বন্ধ বিশ্ববিদ্যালয় কোনো বিশ্ববিদ্যালয় নয়, বিশ্ববিদ্যালয় মানে হচ্ছে খোলা বিশ্ববিদ্যালয় : পুস্তক, পাঠাগার, ক্লাশ, ছাত্রছাত্রী, জীবন ও উল্লাস।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একুশে ও সাহিত্য

একুশে ফেব্রুয়ারিকে আমি মনে করি আমাদের অস্বীকৃত স্বাধীনতা দিবস। বায়ান্নোর এ-দিনটি ও তার আগের দিনের মধ্যে শতাব্দীর ব্যবধান। ওই দিনে ঢাকা নামের পল্লীটি রূপান্তরিত হয়েছিলো বিদ্রোহী শহরে, বদলে গিয়েছিলো ঢাকা, বাঙলাদেশ ও বাঙালি। বাঙালির আর কিছুই আগের মতো থাকে নি, বাঙালি ওই দিনে হঠাৎ মধ্যযুগ থেকে পা রেখেছিলো আধুনিক সময়ে। অবাস্তব হয়ে উঠেছিলো পাকিস্তান, একটি নতুন স্বাধীন দেশের সূচনা হয়েছিলো বায়ান্নোর একুশে ফেব্রুয়ারির বৃহস্পতিবার। বাঙালি রুখে দাঁড়িয়েছিলো ভাষা সামনে নিয়ে, ভাষাই তখন ছিলো বাঙালির জীবন। ভাষা ছাড়া আর কিছু এমন আবেগ জাগাতে পারতো না। আর্থনীতিক শোষণকে ঢেকে রাখা যায় নানা শোভন আবরণে, রাজনীতিক অধিকারহীনতাকে স্বাধীনতার মুখোশ পরিয়ে হাজির করা যায়, কিন্তু ভাষার ওপর কোনো আক্রমণকে শোভন চেহারায় উপস্থিত করা যায় না। বাঙালির ভাষা বিপন্ন হয়েছিলো সেদিন, ওই বিপন্নতা ছিলো বাঙালির জাতিগত বিপন্নতা, তাই রুখে দাঁড়িয়েছিলো বাঙালি। ভাষা-আন্দোলন বহু কিছুকে বদলে দিয়েছে, দেশকে দিয়েছে বদলে, কিন্তু সবচেয়ে বেশি বদলে দিয়েছে সম্ভবত আমাদের ভাষা ও সাহিত্যকে। একুশের আগের বাঙালি মুসলমানদের বাঙলা ভাষা ছিলো অপরিস্রুত, অমার্জিত; তার সাহিত্য ছিলো অনাধুনিক ও নিম্নরুচির। এতোদিন বাঙালি মুসলমান সাহিত্যে যে-বাঙলা ভাষা ব্যবহার ক'রে আসছিলো, তা ছিলো আরবিফারসি দ্বারা দূষিত, অনেকাংশে দুর্বোধ্য। ওই ভাষাকে সাম্প্রদায়িক বাঙলা ভাষাও বলতে পারি। ওই ভাষা যে বাঙালি মুসলমানের মুখের ভাষা ছিলো, তা নয়, পাকিস্তানি সাম্প্রদায়িকতা তাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিলো ওই ভাষা—একটি মিশ্র, দূষিত ভাষা, যা ছিলো পাকিস্তানের মতোই মিশ্র ও দূষিত। এখন ওই ভাষা পড়লে হাসি পায়, দুঃখও লাগে। ভাষা-আন্দোলন ওই দূষিত ভাষার হাত থেকে উদ্ধার করে বাঙলা ভাষাকে; বাঙলা ভাষা হয়ে ওঠে বাঙলা ভাষা। ভাষা-আন্দোলন না ঘটলে এখনো আমরা ওই অমার্জিত ভাষায় কবিতা লিখতাম। ভাষা-আন্দোলনপূর্ব মুসলমানের সাহিত্য ছিলো অনাধুনিক, তাতে এমন কোনো চেতনার প্রকাশ ঘটে নি যার সাথে আধুনিকতার কোনো সামঞ্জস্য রয়েছে। ইরানতুরানের স্বপ্নে বিভোর ছিলেন বিপথগামী কবিরা, অদ্ভুত সমস্ত উপমা উৎপ্রেক্ষা রূপক আমদানি ক'রে চলছিলেন তাঁরা মধ্যপ্রাচ্য থেকে। তাঁদের কবিতায় বাঙলাদেশ প্রায় অনুপস্থিত। তাঁরা লিখে চলেছিলেন কালাতিক্রমণদুষ্ট হাস্যকর পুঁথিসাহিত্য। তাঁদের মধ্যে প্রতিযোগিতা পড়ে গিয়েছিলো কে কতোটা অনাধুনিক হতে পারেন। অথচ তখন বাঙলা সাহিত্যে আধুনিক কবিতা ও উপন্যাস প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, কিন্তু বিপথগামী কবি ও কথাসাহিত্যিকদের লেখায় তার কোনো ছাপ পড়েনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দু-একজন নতুন পথে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু তা সহজ ছিলো না। যদি ভাষা-আন্দোলন না ঘটতো তাহলে তাঁদেরও হয়তো অনাধুনিক কাব্যে আত্মনিয়োগ করতে হতো। পৃথিবী তখন অনেক এগিয়ে গেছে, অনেক এগিয়ে গেছে পশ্চিমের সাহিত্য, এমনিক বাঙলা সাহিত্য; কিন্তু পাকিস্তানি বাঙলা সাহিত্য উৎপাদন ক'রে চলছিলো আবর্জনা। ভাষা-আন্দোলনের পরেই দেখি মুক্তি পেয়েছে আমাদের সাহিত্য; — প্রতিবাদ ও আধুনিক চেতনার মিলনে ওই সাহিত্য হয়ে উঠেছে অভিনব। তাই ভাষা-আন্দোলন বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যকেই করেছে সবচেয়ে স্বাধীন; আধুনিক ও প্রগতিশীল।

একুশের পর আমাদের সাহিত্য হয়ে ওঠে একুশকেন্দ্রিক। চেতনাটি লেখকেরা সংগ্রহ করেন একুশের চেতনা থেকে, এমনকি ওই চেতনা প্রকাশের জন্যেও বেছে নেন ওই দিনটিই। শহীদ দিবস এক সময় ছিলো উজ্জ্বল, রঙিন, অভাবিত, বিচিত্র সংকলনের দিবস, দৈনিকগুলোর পাতাও ছিলো বহুবর্ণিল ও আকর্ষণীয়। সব লেখাই যে চমৎকার ছিলো, এমন নয়; কিন্তু তাতে অভাব ছিলো না আন্তরিকতার; মনে হতো তরুণতম থেকে প্রবীণতম কবি, ও প্রাবন্ধিকেরা এ-দিনটিকে চোখে রেখেই আবেগ ও চিন্তায় আলোড়িত হয়েছেন, আর শিল্পীরা রঙের বিন্যাস করেছেন এ দিনের রঙে রঙিন হয়েই। এখন আর একুশের সংকলন বিশেষ চোখে পড়ে না, যেগুলো বেরোয় তার অধিকাংশই বিমর্ষ পরিশ্রান্ত যেনো সব রঙ ও আবেগ নিঃশোষিত হওয়ার ওপর ওই সংকলনগুলোর দায়িত্ব নিয়েছেন উদ্যোগীরা। একুশে উপলক্ষে এখন বইয়ের মেলা দখল করেছে সে-সব রঙিন ও আবেগাতুর সংকলনগুলোর স্থান। আগে এতো বই বেরোতে না, বই প্রকাশ ছিলো ঘটনা, আর এখন যারা লিখতেও পারেন না, তাঁদেরও বই বেরোয় একুশে উপলক্ষে। আমাদের সাহিত্য আর একুশে থেকে চেতনা সংগ্রহ করে না, কিন্তু প্রকাশিত হয় এ-দিনটিকে ঘিরে। ফেব্রুয়ারি এখন পুস্তক প্রকাশের মাস, বইয়ের মাস। এখন ঈদ উপলক্ষে বেরোয় এক-আধ শো অপন্যাস, আর একুশের মেলায় সেগুলো উপস্থিত হয় পাঁচরঙা মোড়কে বাঁধাই হয়ে। দোকানে দোকানে ছড়িয়ে থাকে সেগুলো কিশোরকিশোরীরা মাদকগ্রস্তের মতো কেনে, এবং সেবন ক'রে সুস্থ বোধ করে। অপন্যাসের মতো প্রবন্ধের বিকাশও ঘটেছে বিশেষভাবে, প্রচুর চিন্তাবিদ দেখা দিয়েছেন চারপাশে। তাঁদের সাংবাদিক চিন্তা প্রবন্ধরূপে দেখা দেয় একুশে। কবিতার দিনকাল এখন খারাপ; কবিতা নিয়ে আর পাগলামো দেখা যায় না; এমনকি কবিদের পাগলামোও আর দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। সব বইয়ের মধ্যেই এখন ধরা পড়ে দুটি ভয়াবহ জিনিস, তা হচ্ছে সৃষ্টিশীলতা ও মননশীলতার অভাব। সাহিত্য যেনো পরিণত হয়েছে প্রথায় : প্রথাগতভাবে লিখিত হচ্ছে কবিতা-অপন্যাস-প্রবন্ধ; কোথাও চোখে পড়ে না প্রথা থেকে উত্তরণের আভাস। মাঝে মাঝেই মনে প্রশ্ন জাগে : আমরা কি এখন সৃষ্টি করে চলছি পৃথিবীর নিকৃষ্টতম সাহিত্য? আমরা কি হয়ে উঠেছি শুধু সময়ের খড়, শুধুই পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছি? অনেক দিন ধ'রেই বাঙলাদেশের সাহিত্যে কোনো ঢেউ নেই, কবিতা-প্রবন্ধ-উপন্যাসে সূত্রপাত হচ্ছে না কোনো নতুন ধারার। নিজেকে ও নিজেদের প্রদক্ষিণ ক'রে চলছি আমরা। এর একটি কারণ সম্ভবত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্বসাহিত্যের সাথে আমাদের যোগাযোগ ক'মে গেছে, আমাদের অধিকাংশ লেখক বিশ্বসাহিত্যের কোনো সংবাদ রাখেন না, অনেকে বাঙলা সাহিত্যও পড়েন না। তাই কবিতায় দেখতে পাই পুনরাবৃত্ত আবেগ ও ময়লাধরা শব্দের বাড়াবাড়ি, প্রবন্ধে কোনো চিন্তার প্রকাশ দেখি না, আর উপন্যাসে জীবন সংকুচিত হয়ে ড্রয়িংরুমে পরিণত হয়েছে। তাই এ-সাহিত্য প্রধানত শিশুপাঠ্য; আমাদের বড়োদের সাহিত্যও একধরনের শিশু সাহিত্য, তাতে এমন কিছু নেই যা উপলব্ধির জন্যে প্রাপ্তবয়স্ক মন ও মস্তিষ্ক দরকার। গবেষণা নামক এক ধরনের জিনিসও চলছে; সেগুলো প্রধানত আবর্জনা সংকলন, উচ্চমাধ্যমিক মানের। অর্থাৎ আমাদের সাংস্কৃতিক মান অনেক নিচে নেমে গেছে, যারা সৃষ্টি করছেন তাঁদের মান নেমে গেছে, আর যারা উপভোগ করছেন তাঁদের মান খুবই নিচুতে। এখনকার প্রাজ্ঞ ব'লে বিবেচিত ব্যক্তির উক্তিতে কোনো প্রজ্ঞা নেই, জ্ঞানী নামে পরিচিত ব্যক্তির রচনায় জ্ঞানের অভাব। অনেকের লেখা তো মূর্খতার প্রচণ্ড প্রকাশ। বাঙলা ভাষাও, অধিকাংশের রচনায়, অত্যন্ত শিথিল, ভুলে ও বিশৃঙ্খলায় পরিপূর্ণ। পরিপূর্ণ শুদ্ধ বাঙলা লিখতে পারেন এমন লেখক এখন খুবই দুর্লভ। একুশে থেকে আমরা পেয়েছিলাম যে-চেতনা, সৃষ্টিশীলতা ও শুদ্ধতাবোধ, তা বিলীন হচ্ছে দিন দিন, ভয় হয় একদিন হয়তো পুরোপুরি লোপ পাবে। বন্ধ্যাত্ব থেকে বন্ধ্যাত্বে, অপরিস্রুতি থেকে অপরিস্রুতিতে হয়তো ফিরে যাবো আমরা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধ্বংস ও সৃষ্টি

আশাবাদী অনুরাগীরা অভিযোগ করেন মাঝেমাঝে আমি নাকি অনবরত হতাশা ছড়িয়ে চলছি দু-হাতে। একবার সুড়ঙ্গের পরপারের আশার আলোর কণিকার কথা বলছি না; আমি নাকি ভেঙে চলছি চারপাশ, ভেঙে ফেলছি সব কিছু কিন্তু কিছু গড়ছি বা সৃষ্টি করছি না। এক তরুণ তো আমাকে দেশের প্রধান নৈরাজ্যবাদী আখ্যা দিয়ে সম্মানিত করেছেন। আশার কথা আমি বলি না, কেননা আশা করার মতো কিছু দেখতে পাই না; খুব গভীরে ডুব দিয়ে আশার নুড়ি খুঁজি অনেক, মুঠোতে একটি নুড়িও ওঠে না। আশার কথা না বলার একটি দার্শনিক কারণও রয়েছে;—আশাকে আমার বেশ স্থূল ব্যাপার বলে মনে হয়, হতাশাকে মনে হয় অনেক গভীর ও সত্য। মানুষের চরম পরিণতি তো হতাশা; যেখানে কবরে বা আগুনে সমাপ্তি সব কিছুর, ধ্বংসই শেষ কথা, সেখানে আশাকে খুবই হাস্যকর মনে হয়। আশা প্রতারণা করে, হতাশা করে না। আমাদের এখানে আশার ফেরিঅলার অভাব নেই, আর সারা পৃথিবীতেই সময় বুঝে আশার ফেরিঅলারা বড়োবড়ো দোকান খুলে বসে। বিংশশতক শেষ হ'তে বসেছে, শতকের শেষভাগে নানা রকম রোগ দেখা দেয়; ওই সমস্ত রোগের একটি হচ্ছে আশা-রোগ। এক প্রতারক মার্কিন দম্পতি এর মধ্যেই বড়োসড়ো বই লিখে ফেলেছেন আগামী শতক সম্পর্কে, বইয়ের পাতায় পাতায় দেখিয়েছেন আশার রঙিন স্বপ্ন; বই খুব বিক্রি হচ্ছে, কয়েক মিলিয়ন ডলার বই প্রকাশের কয়েক সপ্তাহেই জমা হয়েছে তাঁদের ব্যাংকহিসেবে; তবে ওই স্বপ্নগুলো সবটাই বানানো। টাকা বানানোর জন্যে তারা ফেঁদেছেন আশার ফাঁদ, আর তাতে ধরা দিচ্ছে নিরীহ আশাবাদী সরল মানবপাখিরা। একটি আশার বই লিখে ফেলতে পারি আমরাও; —কোনো পণ্য লেখক সাতদিনে একটি আশার বই লিখে পাগল ক'রে দিতে পারেন আশাহীন বাঙালিকে, ভ'রে তুলতে পারেন নিজের থলে। তবে সত্য হচ্ছে আমাদের আশার কিছু নেই, সত্য হচ্ছে ধুঁকে ধুঁকে বেঁচে থাকা বা ম'রে যাওয়া। আমি নাকি ভাঙছি প্রচণ্ডভাবে। ভেঙে ফেলছি নানা রকম মহৎ বিশ্বাস, বড়োবড়ো ভাবমূর্তি চুরমার করছি, একাডেমি ভাঙছি, বিশ্ববিদ্যালয় ভাঙছি, রাজনীতিক দলগুলো ভাঙছি; কিন্তু গড়ছি না, সৃষ্টি করছি না। আমি কোনো মহৎ বিশ্বাস উপস্থিত করছি না তরুণদের সামনে, তাদের বলছি না এতে বিশ্বাস রাখো তোমরা, সব বিপদ কেটে যাবে। বরং আমি নাকি বিশ্বাসের মোটামোটা স্তম্ভগুলো সম্পর্কে অবিশ্বাস জাগিয়ে চলছি। পৃথিবী জুড়ে আছে অসংখ্য ভাবমূর্তি; আমাদের দেশি ভাবমূর্তিরও অভাব নেই। ওই সব ভাবমূর্তির নাম ধ'রে শ্লোগান দিয়ে জীবন ধারণ করি আমরা কিন্তু আমি ওসব ভাবমূর্তি চুরমার করছি। বিদ্রোহীকে আমি স্বীকার করছি না বিদ্রোহী ব'লে, মনীষীকে সামান্য ব'লে উপস্থিত করছি, পণ্ডিতের লাশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুঁড়েখুঁড়ে দেখিয়ে দিচ্ছি তাঁদের নিরক্ষরতা। একটি ব্যাংকের মতো একাডেমি গড়েছিলাম আমরা, বিশ্ববিদ্যালয়ে পুষছিলাম জ্ঞানী অধ্যাপক; কিন্তু এক ভোরে নীলাকাশ থেকে বজ্রপাত নেমে এলো। ধসে পড়লো একাডেমি আর বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞানীরা। আমি নাকি একটি রাজনীতিক দলকেও অনুমোদন করছি না; এতো দল আমাদের, কিন্তু একটিকেও ভাবছি না সম্ভাব্য ত্রাতা হিসেবে। সংস্কৃতি জগতে অনেকে বেশ ক'রে খাচ্ছেন, অনেকে ব্যবসা করছেন প্রগতির, সম্মানিত হচ্ছেন দিকে দিকে, কিন্তু আমি চলছি তাঁদের মহিমা হরণ ক'রে। শুধু ভাঙছি, এবং ভাঙছি এবং ভাঙছি; কিছুই সৃষ্টি করছি না, গড়ছি না। আমি যখন তাকাই আমাদের সমাজ-রাষ্ট্র-সভ্যতার দিকে, তখন তাকে একটি নড়োবড়ো কুঁড়েঘর ব'লে মনে হয়; —তার চালে পচন ধরেছে, বেড়ায় পচন ধরেছে, থাম নড়োবড়ো হয়ে গেছে, ভিটে জুড়ে অসংখ্য ইঁদুরের গর্ত। এমন একটি কুঁড়েঘরকে ঠ্যাকা লাগিয়ে টিকিয়ে রাখার চেয়ে ধ্বংস ক'রে ফেলাই ভালো। তাকে ধ্বংস করাই এক ধরনের সৃষ্টি।

আমরা এখন ইতিহাসের এমন একটি মলমাস পেরোচ্ছি, যা সৃষ্টির সময় নয়, বরং ধ্বংসেরই সময়। এখন ধ্বংসই সৃষ্টি। আমাদের কোনো কাজে মহত্ত্ব নেই, আমরা সভ্যতা ও মানুষের কথা ভাবি না, মানুষের ভেতরে যা সবচেয়ে আদিম, সবচেয়ে পাশবিক, আমরা তারই সমষ্টি। আমাদের কুঁড়েঘরের চাল, বেড়া, থাম, ভিটি লক্ষ্য করলে ছুঁচোদের ক্রিয়াকলাপের কথাই মনে প'ড়ে। জীবন ও সভ্যতার প্রধান নিয়ন্ত্রক যে-রাজনীতি, তা পুরোপুরি নষ্ট আমাদের কোনো দলের ওপরই পুরোপুরি আস্থা পোষণ করা অসম্ভব; কোনো দলেরই কোনো লক্ষ্য নেই; প্রতিটি দলের লক্ষ্য ক্ষমতা ও অর্থ। পশ্চিমের পুঁজিবাদী দেশগুলোতে রয়েছে সামাজিক রাষ্ট্রিক নৈতিকতা, ব্যক্তিক নৈতিকতাও তাদের কম নয়, আমাদের এখানে সামাজিক রাষ্ট্রিক ব্যক্তি নৈতিকতা পুরোপুরি অনুপস্থিত। নীতির কোনো চিহ্নও চারপাশে দেখতে পাই না। নৈতিক অধঃপতন আমাদের কতোটা অতলস্পর্শী, তার পরিচয় পাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির গৃহীত একটি প্রস্তাবে। প্রস্তাবে গৃহীত হয়েছে যে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের গাড়ির জীবনবীমা করে দেবে; যে-একজন শিক্ষদের গাড়ি পোড়া গেছে, তাঁকে একটি নতুন গাড়ি কিনে দেয়া হবে। কী নৈতিক অধঃপতন! যেখানে ছাত্র নিহত হচ্ছে মাসে মাসে, জীবনের কোনো নিরাপত্তা নেই শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর, অধিকাংশ শিক্ষককে আবাসিক সুবিধা দিতে পারছে না বিশ্ববিদ্যালয়, অনেক শিক্ষক বাস করেন বস্তিতে, গ্রন্থাগারে নেই বই, সেখানে প্রস্তাব নেয়া হচ্ছে গাড়ির জীবনবীমার ও নতুন গাড়ির। গাড়ি আছে ক'জন শিক্ষকের? এখানে শিক্ষকছাত্রের জীবনের বীমা নেই, কিন্তু গাড়ির জীবনের বীমা আছে। এমন অনৈতিকতাকে কী ক'রে টিকিয়ে রাখি, একে ধ্বংস করাই তো সৃষ্টি। আমাদের সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপের জগতটি ভ'রে গেছে বিভিন্ন তালবাজে; —শিল্পীর তুলিতে সৃষ্টি হচ্ছে না নতুন শিল্পকলা, নর্তকনর্তকী নাচ আটকে রাখছে হাজার বছর পেছনে, কবিতা উপন্যাস নাটক প্রবন্ধ ভ'রে গেছে বন্ধ্যাত্বে; কিন্তু একেই কি রাখতে হবে টিকিয়ে, স্তব করতে হবে এরই মহিমা? ব্যক্তির জীবনে যেমন নিস্ফলা সময় আসে, জাতির জীবনেও আসে তেমনি। কোনো জাতিই সময়ের প্রতিটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্তরে সৃষ্টিশীল থাকে না, অনেক সময়ই থাকে অনাসৃষ্টিশীল। আমরা এখন তেমন একটি পর্যায়ে রয়েছি। এখন পুরোনোকে, অন্তঃসারশূন্যতাকে, প্রথাকে, মিথ্যা ভাবমূর্তিকে ভেঙে ফেলাই সৃষ্টি। অসংখ্য ছানিতে আমাদের চোখ ভ'রে গেছে, চোখ থেকে এখন নির্মমভাবে তুলে ফেলতে হবে ছানির অসংখ্য স্তর, তারপর তাকাতে হবে নতুন চোখে। তখন আসবে সৃষ্টির সময়। তখন রাজনীতি হবে সৃষ্টিশীল, সংস্কৃতি হবে সৃষ্টিশীল, ফিরে পাবো নৈতিকতা বা সৃষ্টি করবো নতুন পরিশুদ্ধ নৈতিকতা, শিল্পের সমস্ত শাখায় তখন দেখা দেবে নতুন সৃষ্টির শিহরণ। এখন যারা পুরোনোকে, প্রথাকে, মিথ্যে ভাবমূর্তিকে ও শ্লোগানকে, নষ্ট শিল্পকলাকে, কপট প্রগতিশীলতাকে সমর্থন করে যাচ্ছে, তারাই আসলে কাজ করছে নতুন সৃষ্টির বিরুদ্ধে। আমাদের সমাজ খুবই প্রথাগত, প্রথার জয়গানে এর রক্তমাংস জীর্ণ হয়ে গেছে। জয়গানের বদলে এখন প্রশ্ন করা দরকার, বার বার দরকার প্রশ্ন করা, কোনো কিছুকেই আর বিনা প্রশ্নে উত্তীর্ণ হতে দেয়া ঠিক হবে না। তবে এখানে প্রশ্নের বড়োই অভাব। এখানে বিদ্রোহীও ব্যক্তিগত জীবনের তোষামোদপরায়ণ; কবিতায় যিনি সব কিছু ভাঙার ধ্বনি দেন, তিনিও ব্যক্তিগত জীবনে প্রভুর কৃপা ভিক্ষা করেন। তাই এখানে প্রথা ধ্বংস হয় না, টিকে থাকে; সময় আসে না নতুন সৃষ্টির। এখন ধ্বংস করে যেতে হবে, এ-সময়ে ধ্বংসই সৃষ্টি। এরপর আসবে পুরোপুরি সৃষ্টির কাল। অন্যরা যখন পুরোনো শ্লোগানে মেতে আছেন, আমি সম্ভবত সৃষ্টির জন্যে ধ্বংস করে চলেছি। একদিন দেখতে পাবো এ-কুঁড়েঘরের সব কিছু ধসে পড়েছে। তারপর আসবে অবিরল সৃষ্টির সময়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রেম

পুঁজিবাদী পর্বের সবচেয়ে বড়ো ও জনপ্রিয় কুসংস্কারের নাম প্রেম। পশ্চিমে আড়াই শো বছর, আর আমাদের দেশে একশো বছর ধ'রে প্রেম হয়ে উঠেছে লৌকিক ধর্ম। প্রেমের কথা এতো রটানো হয়েছে, এবং চারপাশে এর কথা এতো বলা হয় যে এতে আক্রান্ত হওয়ার জন্যে ব্যগ্র হয়ে থাকে সবাই, যদিও মানুষ প্রেমে বাঁচে না। মানুষের জীবনের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দাঁত মাজা, জুতো পরা, খাওয়া, বদমাশি কাজ, ঘুম, কামের জন্যে বরাদ্দ থাকে নির্দিষ্ট সময়, প্রেমের জন্যে কোনো সময় বরাদ্দ থাকে না; তবু প্রেমকে মনে করা হয় মহৎ। এটা মানুষের এক মহৎ ভণ্ডামো। প্রেম জীবনের নয়, শিল্পকলা ও ব্যবসার শ্রেষ্ঠ পুঁজি, পৃথিবী জুড়ে প্রেমের নামে এখন প্রতিদিন বিলিআন ডলার বিনিয়োগ করা হয়, এবং টাকাটা তুলে নেয়া হয় সুদে আসলে। প্রেম পণ্য হিসেবে সবচেয়ে ভালো, বাজারে এর চাহিদা তেলের থেকেও অনেক বেশি; নিশ্চিন্তে নিশ্চিতভাবে এর ওপর টাকা খাটানো যায়। জীবনে এর দরকার খুবই কম; সিগারেট না থাকলে রক্তে জ্বালা ধ'রে, কিন্তু আজ বুকে কোনো প্রেম বোধ করিনি ব'লে কেউ বুকে জ্বালা বোধ করে না। বিয়ে ব'লে যে প্রথাগত ব্যাপারটি রয়েছে, প্রেম তার শর্ত নয়; বরং প্রেম না থাকলেই বিয়েটা আদর্শ বিয়ে হয়ে ওঠে। বিয়ে ও সংসারের মতো একটা পিতৃতান্ত্রিক ব্যাপারে প্রেম বিপত্তির মতো। প্রেম হচ্ছে নিরন্তর অনিশ্চয়তা; বিয়ে ও সংসার হচ্ছে চূড়ান্ত নিশ্চিন্তির মধ্যে আহার, নিদ্রা, সঙ্গম, সন্তান, ও শয়তানি।

চোদ্দো-পনেরো-ষোলো বছর বয়সের দিকে বালকবালিকারা বুকের বাঁ পাশে একটা কেমন কেমন কাতরতা বোধ করতে থাকে। স্বপ্নে দেখতে থাকে রাজপুত্র রাজকন্যাকে; এক সময় ওই রাজপুত্র রাজকন্যার রূপ ধ'রে দেখা দেয় পাশের বাড়ির ছেলে বা মেয়েটি। তাকে দেখতে থাকে সবখানে : মেঘে, গাছের পাতায়, পুকুরের জলে, দেয়ালে; তার চারদিক কুয়াশায় ভ'রে যায়, বুকের ভেতর শিশির জমতে থাকে। বদলে যায় বুকের ভেতরের জলবায়ু, রক্তের রঙও হয়তো, হয়তো ঘোলাটে হয়ে যায় একটু। প্রেম এক মানসিক রোগের মতো অবস্থা; সেটা সুস্থ অবস্থায়। প্রেমিকপ্রেমিকা কখনোই সুস্থ নয়। তাদের জগত অগ্নিগিরির চূড়োয়, সব সময় কম্পমান। বাঙলায় বলা হয় 'প্রেমে পড়া'; ব্যাপারটি পতনের, কোনো খাদে প'ড়ে যাওয়ার। এর নানা লক্ষণ দেখা দেয়। প্রেমিকপ্রেমিকা ঘুমোতে পারে না, ক্ষুধা থাকে না তাদের, তারা থাকে নিরন্তর উদ্বেগের মধ্যে।

প্রেম ঝড়, বিস্ফোরণ, জোয়ার, বা ফুল ফোটার মতো অচিরস্থায়ী আবেগ। ঝড় দিনের পর দিন চলতে পারে না, ফুল ফুটে থাকতে পারে না বছর ধ'রে। প্রেমের ঝড়ের বিস্ফোরণের পর থাকে ভাঙা ঘরবাড়ি, জোয়ারের পর থাকে নদীতে ভেসে-আসা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পোড়াকাঠ, ময়লা মাটি। যে-ফুল মাসের পর মাস ফুটে থাকে, তা ফুল নয়; প্লাস্টিকের ফুল। প্রেমও মাসের পর মাস ফুটে থাকতে পারে না। প্রেম হচ্ছে প্রেমের তীব্র আবেগটুকু, যখন তা বিয়ারের ক্যানের মতো কানায় কানায় ভরা থাকে; খুললে উপচে পড়ে, তারপর সমস্ত শীতল।

দিনের পর দিন অবিরাম চলতে পারে না ভূমিকম্প।
মাটি ও মানুষকে কয়েক মুহূর্তে থরথর ক'রে
আলোড়িত এলোমেলো ক'রে থেমে যায়—
যে-রকম আমাদের ভালোবাসা।

চৈত্রের গোলাপ টকটকে লাল হয়ে জ্বলে তিন চার দিন।
দীর্ঘশ্বাসের মতো এক গোপন বাতাসে
অগোচরে ঝ'রে যায় অমল পাপড়ি—
যে-রকম আমাদের ভালোবাসা।

তোমার চোখের পাতায় অশ্রুবিন্দু এতো সুন্দর ক্ষণায়ু।
আমাদের অস্তিত্বের মতো টলমল ক'রে উঠে
মুহূর্তেই অনন্তে ঝ'রে যায়—
যে-রকম আমাদের ভালোবাসা।

AMARBOI.COM

প্রেমের মধ্যে সবচেয়ে ভালো বাল্যপ্রেম। পাশাপাশি বাড়িতে পাশাপাশি বাড়তে বাড়তে চোদ্দপনেরো বছরের দিকে বালকটি দেখে বালিকার চোখে ফুল ফুটছে, মাংসে ফুল ফুটছে, চোখে মহাসমুদ্রের থেকেও বড়ো বড়ো অশ্রুবিন্দু দেখা দিচ্ছে; বালিকা দেখে বালকটি অন্ধ হয়ে গেছে, তাকে ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না, তার দিকেও ঠিকমতো তাকাতে পারছে না; দেখে বালকটির হাত কাঁপছে, পা কাঁপছে, মহাজগত কাঁপছে। এতোদিন তারা একে অন্যকে বলছিলো, 'তুই'; ওই দিন তারা ব'লে ওঠে : 'তুমি'। সে-মুহূর্তে মহাজগতের ইতিহাসে এক যুগান্তর ঘটে। তারা আকাশ ভ'রে গোলাপ, আর মাটি ভ'রে নক্ষত্র ফুটে থাকতে দেখে। তারা হাতে আঙুল নিয়ে খেলে, হাত ধ'রে থাকে সকলের চোখের আড়ালে। তারা এক মাসে তিনশো চিঠি লেখে, দিনরাত মনে মনে চিঠি পড়তে থাকে। ওই চিঠি রবীন্দ্রনাথের কবিতার থেকে অনেক কাব্যিক, ঐশী শ্লোকের থেকে অনেক পবিত্র। প্রেমে পড়ার সময় হঠাৎ ভোরের অনেক আগে ঘুম ভেঙে যায়, নিজেকে মনে হয় মহাশূন্যে ভাসমান। কিন্তু যার আবেদনে সাড়া মেলেনি, তার মহাজগত ভ'রে যায় তীব্রতম গরলে; সে ঘুমোতে পারে না, মাঝরাতে একা একা হাঁটে, মনে মনে ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে বা আজকাল বালিকার মুখটিকে নিজের ক্ষুধার মতো সুন্দর ক'রে দেয়ার জন্যে অ্যাসিডের দোকানে যায়।

প্রেম কামের ভূমিকা, পূর্বরাগ হচ্ছে অজস্র সঙ্গমের জন্যে দীর্ঘপ্রস্তুতি। মুখোমুখি বসা, একটু হাত ধরা, হঠাৎ বুক থেকে গান বা কবিতা লাফিয়ে ওঠা হচ্ছে বিকল্পসঙ্গম। প্রেমিকপ্রেমিকা যখন এগোতে থাকে পরস্পরের শরীরের দিকে কমতে থাকে তাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গান ও কবিতা, তখন গান শুরু ক'রে মাংস ও রক্ত। প্রেমের মধ্যে আধিপত্যের বোধটিও থাকে প্রবলভাবে, প্রেমিক অধিকার করতে চায় প্রেমিকার দেহটি; সে মনে করতে থাকে ওটি তার সাম্রাজ্য, যেটিকে একদিন সে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত করবে। প্রেমিকাকে হারিয়ে ফেলার সম্ভাবনা দেখা দিলে তার মনে জেগে ওঠে প্রবল ঈর্ষা; সে দুঃস্বপ্ন দেখতে থাকে ওই দেহটি ভোগ করছে অন্য একটি পুরুষ, আর সে পাগল হয়ে ওঠে। একবার মাংসের স্বাদ পাওয়ার পর প্রেমিকপ্রেমিকা আর বারান্দায় সুখ পায় না; তারা চ'লে যায় ঝোপের আড়ালে, কথা কমে বাড়ে ওষ্ঠ ও আঙুলের কাজ; তারপর কোনো একান্ত কক্ষ পেলে ঢোকে পরস্পরের ভেতরে। এই তো প্রেম। বাঙলাদেশ প্রেমের জন্যে উপযুক্ত ভূভাগ নয়।

প্রেম জীবনে বারবার আসে। পিতৃতন্ত্র পুরুষের জন্যে যেমন কামের অজস্র দরোজা খোলা রেখেছে, তেমনি প্রেমের জন্যেও রেখেছে; নারীর জন্যে রাখে নি। নারীপুরুষ বার বার প্রেমে পড়তে পারে, পড়ে, যদিও চারপাশে রটানো হয় শাশ্বত প্রেমের বিজ্ঞাপন। শাশ্বত প্রেম হচ্ছে একজনের শরীরের ভেতরে ঢুকে আরেকজনের স্বপ্ন দেখা। প্রেমিকপ্রেমিকা স্বামীস্ত্রী হয়ে ওঠার পর প্রেম হয়ে ওঠে হাস্যকর; তারা কামের আবেগ বোধ করে, কিন্তু বুকে একবারও প্রেমের কাঁপন বোধ করে না। কেননা ধারাবাহিক প্রেমের উত্তেজনার মধ্যে মানুষ বাস করতে পারে না, মানুষকে যাপন করতে হয় অনুত্তেজিত সাদামাটা জীবন। তবে আবার যখন তারা প্রেমে পড়ে অন্য কারো সাথে, দেখা দেয় তীব্র উত্তেজনা, ঘুমহীনতা, ঝড়, ভূমিকম্প, বা গোলাপ ফোটা। দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম প্রেম ব'লে কোনো কথা নেই; প্রতিটি প্রেমই প্রথম প্রেম। প্রতিটি প্রেমই শরীরের দিকে যাত্রা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমলাতন্ত্র কি এক ধরনের পশুতন্ত্র?

আমলা শব্দটি এখন আর ভালো শোনায় না, একটা খারাপ গালি ব'লে মনে হয়। শব্দটির অর্থের পতন ঘটেছে, নিন্দাসূচক হয়ে উঠেছে শব্দটি। শব্দের নিজের কোনো দোষ নেই, গুণও নেই; যার সাথে জড়িত থাকে শব্দ, তারই সংস্পর্শে শব্দ দূষিত হয়, প্রশংসাসূচকও হয়। একটি অশোভন ব্যাপারের সাথে জড়িত থাকার ফলে ইংরেজি প্রিভি, ল্যাট্রিন, টয়লেট, বাথরুম, ডব্লিউসি প্রভৃতি শব্দ দূষিত হয়েছে; বার বার শব্দ বদলিয়েও ব্যাপারটিকে শোভন করা যায় নি। ওই শব্দগুলোর কোনো অপরাধ ছিলো না। আমলা শব্দটিও নির্দোষ, নিরপরাধ; তবে যাদের সাথে এটি জড়িত কয়েক শতক ধ'রে, তাদের দূষিত প্রতিভাই শব্দটিকে দূষিত করেছে। আমলারা একটি স্বার্থপরায়ণ সুবিধাভোগী শ্রেণী; যদিও তাদের জন্ম দেয়া হয়েছিলো জনগণের সেবার জন্যে, কিন্তু সেবার বদলে শক্তিকেন্দ্রে ব'সে তারা শোষণপীড়ন করেছে জনগণকে। তবে তারাও সেবা করে, তারা সেবা করে শক্তিমানদের; যারাই ক্ষমতা দখল করে আমলারা হয়ে ওঠে তাদেরই একান্ত বিনীত সেবক। আমলারা বিবেকে বিশ্বাস করে না, বিশ্বাস করে স্বার্থে ও শক্তিতে। নানা শক্তিকেন্দ্রে থাকার ফলে তারা উপভোগ করে বিপুল ক্ষমতা। যে-ক্ষমতা তাদের দেয়া হয়, তা তো তারা উপভোগ করেই, এমনকি যে-ক্ষমতা তাদের দেয়া হয় না, তাও সম্ভোগ করে তারা। ক্ষমতার অপব্যবহারই শক্তি, সদ্ব্যবহার কোনো শক্তি নয়। আমাদের আমলারা ক্ষমতা অপব্যবহারেই দক্ষ। সব ক্ষেত্রে তারা অহমিকাপরায়ণ, উদ্ধত, কিন্তু শক্তিমানদের কাছে তারা বিনীত ভৃত্যের মতো; এবং তারা দুর্নীতিপরায়ণ, পীড়নবাদী, তারা বিলাস ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ। এমন কোনো দোষ নেই, যাতে তারা অলঙ্কৃত নয়। শ্রেণীচরিত্রে তারা সবাই এক, যদিও দু-একটি খাপ-না-খাওয়া আমলা থাকা অস্বাভাবিক নয়। আমলারা শক্তিমান, তাই জনগণ তাদের সমীহ করে; কিন্তু শ্রদ্ধা করে না। সম্প্রতি একটি দৈনিকে এক আমলা নিজের শ্রেণীর মহিমা গান করতে গিয়ে নিজেকে ও নিজের শ্রেণীকে আরো ডোবানোর উপক্রম করেছেন। তিনি ভেবেছিলেন তাঁর অহমিকায় জনগণ মুগ্ধ হয়ে ধন্যধন্য করবে, কিন্তু তাঁকে হতাশ করে চারদিক থেকে রিরি ধ্বনি উঠতে থাকে। ওই আমলাটি সম্ভবত একটু সরল, তাই পরিচয় দিয়েছেন নির্বুদ্ধিতার। মাখনেরুটিতে তিনি বেশ আছেন, এ নিয়েই তাঁর সন্তুষ্ট থাকা উচিত ছিলো; মহিমা দাবি করতে গিয়েই তিনি ডুবিয়েছেন নিজেকেও নিজের মহান শ্রেণীটিকে। আমলাতন্ত্রকে ঘোড়ার রূপকে দেখতে গিয়েই তিনি পড়েছেন প্রথম বিপদে। তিনি হয়তো বুঝতে পারেন নি যে বাঙলাদেশে আর কোনো কিছু রূপক হিসেবে ব্যবহৃত হয় না, সব কিছুই প্রকাশ করে আক্ষরিক অর্থ। ঘোড়া যতোই তেজি হোক-না-কেনো, তা একটি জন্তু, অর্থাৎ পশু; আর পশু হচ্ছে পশু। তাই আক্ষরিকার্থে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমলাতন্ত্র হয়ে উঠেছে, পশুতন্ত্র, যা স্বীকার করে নিতে জনগণের কোনো দ্বিধা তো নেইই, বরং জনগণ এ-ধারাটিকেই যথার্থ ব'লে মনে করে। জনগণ এতো দিন যাদের পশু ব'লে ভেবে আসছিলো যাদের পায়ের নিচে থেঁতলে যাচ্ছিলো, অথচ স্পষ্টভাবে বলতে পারছিলো না যে তারা একটি বিরাট পশুতন্ত্র দ্বারা পীড়িত, তারা হঠাৎ আমলার মুখে আত্মকথা শুনে খুব সুখী বোধ করছে। ওই আমলা নিজের শ্রেষ্ঠতা বোঝানোর জন্যে অনেক কিছু দাবি করেছেন, যা শিশুসুলভ ও হাস্যকর; এবং কোনো কোনো অংশে অশ্লীল। তিনি দাবি করেছেন আমলারা মেধাবী, তারা প্রথম শ্রেণী পাওয়া। কিন্তু এ প্রথম শ্রেণী কোনো কাজে লাগে নি, তা সেবা করছে তৃতীয় শ্রেণীর। ওই আমলা যাদের স্যার স্যার করে, ওই মন্ত্রীরা তো তৃতীয় শ্রেণীরও নয়। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রথম শ্রেণীর ছাত্র তৈরি করেছে তৃতীয় শ্রেণীকে স্যার স্যার করার জন্যে। এতে বোধহয় আমলারা গৌরব বোধ করে। আমলাদের রূপসী স্ত্রী লাভের কথাও তিনি গর্বের সঙ্গে বলেছেন শুধু এটুকু বলেন নি ওই রূপসী স্ত্রীরা আমলাদের চোখে বেশি দিন রূপসী থাকে না, আর পৃথিবীতে নতুন রূপসীরাও দেখা দেয়, অধস্তনদের রূপসী স্ত্রী থাকে এবং আমলারা নতুন রূপে বার বার মুগ্ধ হয়। আমলাদের পারস্পরিক স্ত্রী বদল তো খুবই পরিচিত ঘটনা। এই তাদের প্রধান সাংস্কৃতি।

বাঙলাদেশের আমলাতন্ত্রে সম্ভবত জড়ো হয়েছে পৃথিবীর সেরা ঘোড়াগুলো; এমন পেশল ও প্রতিভাবান ঘোড়া আর পাওয়া যাবে না কোথাও। তাদের প্রতিভার কোনো শেষ নেই। ক্ষমতার অপব্যবহারে তারা দক্ষ, দুর্নীতিতে অদ্বিতীয়, নারী সৌন্দর্যের তারা প্রবল উপাসক, এমনকি শিল্পসাহিত্যের এলাকায়ও তারা অপ্রতিহত। সবক্ষেত্রেই তারা বিশ্বাসী উপরি আয়ে। তারা শুধু অর্থসম্পদ অবৈধভাবে উপার্জন ক'রেই পরিতৃপ্ত থাকে না, তারা মানসম্মানকেও তাদের উপরি আয় ব'লে গণ্য ক'রে থাকে। পার্থিব অপার্থিব সব কিছু অর্জনেই চোখে পড়ে জেলা প্রশাসকই সবকিছু সেখানে; সে এখানে সভাপতি, ওখানে প্রধান অতিথি, এখানে ফুলের মালা নিচ্ছে, ওখানে নিচ্ছে ফুলের তোড়া। এসব তারা পায় ক্ষমতা ব্যবহার ক'রে; তাদের প্রধান অতিথি না করা হ'লে জেলার কোনো সংস্থা কোনো সরকারি সাহায্য পায় না। শুনেছি আমলা লেখকরাও পত্রপত্রিকা ও প্রকাশকের ওপর চাপ সৃষ্টি, লেখা ছাপানোর জন্যে নিজের (অর্থাৎ জনগণের) সংস্থা থেকে ঋণ দেয় পত্রিকার মালিককে। বাঙলাদেশের অনেক আমলা তিন অক্ষরের সিএসপি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে নি, পিএইচডিও হয়ে উঠেছে। আমলাদের পিএইচডি ডিগ্রির কোনো দরকার নেই, তবু অনেকে সেটা নিয়েছে, আর যেভাবে নিয়েছে তাও খুব পরিচ্ছন্ন নয়। যে-বৃত্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষকেরা পেতে পারতো, তা বিশেষ কৌশলে বাগিয়ে নিয়েছে তারা। এতে তাদের সুবিধা হয়েছে, কিন্তু দেশের ক্ষতি হয়েছে। আমলাদের অবৈধ আয়ের কোনো সীমা নেই। মহকুমা ও উপজেলা থেকে শুরু ক'রে তারা যে কতোভাবে অবৈধ উপায় করে তা ভালোভাবে জানে শুধু আমলারা। বাঙলাদেশ তিনটি তন্ত্রের শিকার, এগুলো হচ্ছে রাজনীতিকতন্ত্র, আমলাতন্ত্র ও সেনাতন্ত্র; তবে এদের মধ্যে আমলাতন্ত্রই সুবিধাসম্ভোগ করে বেশি। সুবিধালাভের জন্যে রাজনীতিকদের দুশ্চরিত্র হ'তে হয়, তারা পুরোপুরি নিন্দিত। তবে তারা সবাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সব সময় সুযোগ পায় না; বিশেষকালে বিশেষ দালালেরা সুবিধা লাভ করে। সেনাতন্ত্র যখন নিজের এলাকা পেরিয়ে ক্ষমতা দখল করে, তখন সুযোগসুবিধায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। কিন্তু আমলাতন্ত্র সুবিধা ভোগ করে সব সময়; পাকিস্তানপর্বে তারা সুবিধা সম্ভোগ করেছে বিনীত পাকিস্তানি আমলারূপে, স্বাধীনতার পর তারাই লাভ করেছে সবচেয়ে বেশি সুবিধা, উপসচিব একলাফে সচিব হয়ে গেছে; আবার সামরিকতন্ত্রের কালে তারা পাচ্ছে সর্বাধিক সুবিধা; এখন তারা নিয়মিত মন্ত্রী হচ্ছে, আমলা থাকতে আর ভালো লাগছে না। অবসরপ্রাপ্ত আমলারাও এমন ব্যবস্থা করে নেয়, যাতে বিনাশ্রমে মাসে লাখ টাকা ঘরে আসে। এ-আমলাতন্ত্রকে যদি ঘোড়তন্ত্র অর্থাৎ পশুতন্ত্র বলা হয়, তাহলে নিন্দা করা হয় না। দেশ চালানোর জন্যে আমলা দরকার, তবে আমলাতন্ত্র দরকার নয়, বরং তা ক্ষতিকর। আমাদের দেশে জনগণ স্বাধীন রাষ্ট্রে পরাধীন নাগরিকের মতো বাস করে; তারা যেখানেই যায় দেখে প্রভুর ভঙ্গিতে ব'সে আছে বিভিন্ন আমলা। প্রত্যেকে তার ওপরে অর্পিত দায়িত্বকে ব্যবহার করে ক্ষমতা হিসেবে। আমাদের আমলাতন্ত্র যে পশুতন্ত্রে পরিণত হয়েছে, তার কারণ যারা রাষ্ট্র অধিকার করে আছে কয়েক শতাব্দী ধরে, তারা জনগণের প্রতিনিধি নয়। এককালে তারা ছিলো ব্রিটিশ, পরে পাকিস্তানি, এবং স্বাধীনতার পর দেশ অধিকার করেছে গণশত্রু সুবিধাভোগীরা। প্রতিটি পর্বে আমলাতন্ত্র পশু থেকে আরো পশু হয়ে উঠেছে, বিকাশ ঘটিয়েছে পশুতন্ত্রের। এদের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে সবচেয়ে কম যা দরকার, তা হচ্ছে দেশকে আমূল বদলে দেয়া। বাঙলাদেশ এখন যেমন আছে তেমনই থাকবে আর আমলাতন্ত্র হয়ে উঠবে দেবদূততন্ত্র এটা আশা করা অন্যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপাচার্যগণ, তাঁদের সংস্কৃতি ও পরিণতি

যদি বলি তৃতীয়-চতুর্থমানের অধ্যাপকেরাই উপাচার্য নির্বাচিত ও মনোনীত হন, বেশ খর্ব ব্যক্তিরা বিস্ময়করভাবে অধিকার করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে উঁচু পদটি—অবশ্য পদের কোনো মূল্য নেই আমার কাছে—তাহলে সত্য থেকে আমি কতোটা দূরে থাকি? বইপত্র থেকে সাধারণত যারা দূরে থাকেন, জ্ঞানী ব'লে যারা গণ্য হন নি ও হবেন না, অধ্যাপকসমাজে যারা ব্যাপক পরিহাস উপহাসের পাত্র, যাদের সাংস্কৃতিক মান অত্যন্ত নিচু, মৃত্যুর পর যারা একটি লাশ ছাড়া আর কিছু রেখে যাবেন না, তারাই একদিন প্রকৃতি ও রাজনীতির অমোঘ বিধানে উপাচার্য হন। আমি বেশ কয়েকটি বা কয়েকজন উপাচার্য দেখেছি; তাঁদের যে-দিকটি আমার মনে দাগ কেটেছে, তা হচ্ছে তাঁদের নিম্ন সাংস্কৃতিক মান। তাঁদের অনেকে উপাচার্য শব্দটিও ঠিকমতো উচ্চারণ করতে পারেন না। তারা অশুদ্ধ বাঙলায় কথা বলেন ও নথিপত্র লেখেন, ইংরেজি বলতে গেলে সৃষ্টি করেন একটি নতুন ভাষা যার নাম দিতে পারি 'উপাচার্যের ইংরেজি'। উপাচার্যরা সভাপতি ও প্রধান অতিথি হ'তে ভালোবাসেন, সুবিধাবাদী সংগঠনগুলোও খুব ভালোবাসে উপাচার্যদের সভাপতি-প্রধান অতিথি ক'রে আনতে; এবং উপাচার্যরা সেখানে লোমহর্ষক বক্তৃতা দিয়ে থাকেন। গরু, ছাগল, কাতলা মাছ থেকে পিকাসো, রবীন্দ্রনাথ, আরিস্ততল সম্পর্ক নির্ভয়ে তাঁরা বক্তৃতা দেন; কথায় কথায় ভুল শব্দ প্রয়োগ করেন, উচ্চারণের একশেষ ক'রে ছাড়েন, পিকাসোকে 'পিসাকো' লেনিনকে 'লেলিন', সাঁঝের মায়াকে 'সাজের মেয়ে' বলেন, সত্যজিতের চলচ্চিত্র উৎসবে গিয়ে সত্যজিৎকে মৃত ভেবে তার রুহের মাগফেরাত কামনা করেন। টিভির এক অনুষ্ঠানে এক উপাচার্যকে তার প্রিয় কবিতার পঙ্‌ক্তি বলতে অনুরোধ করা হয়েছিলো; ওই উপাচার্য অনুরোধ শুনে শিশুর মতো এদিক-সেদিক তাকাচ্ছিলেন, তারপর শিশুর মতোই বলেছিলেন তাঁর প্রিয় কবিতার পঙ্‌ক্তি হচ্ছে, 'ওই দেখা যায় তাল গাছ ওই আমাদের গাঁ, সেইখানেতে বাস করে কানিবগের ছা।' আমাদের অধিকাংশ উপাচার্যের সংস্কৃতিকে বলতে পারি কানিবগের সংস্কৃতি। এরা যখন ভার পান একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের তখন সেটিকে নামিয়ে নেন নিজের স্তরে চারপাশে ছড়িয়ে দেন নিজেদের অপসংস্কৃতি। এক উপাচার্য সম্প্রতি শহীদ শিক্ষকদের পত্নীদের আখ্যায়িত করেন 'দুস্থ মহিলা' রূপে; —এটা যে তিনি খারাপ উদ্দেশ্যে থেকে করেছেন, তা নয়; তাঁর উদ্দেশ্য হয়তো ছিলো খুবই চমৎকার, কিন্তু তাঁর সাংস্কৃতিক নিম্নতার কারণে ঠিক শব্দটি বা ধারণাটি বেছে নিতে পারেন নি তিনি। প্রকাশ ক'রে ফেলেছেন নিজের সাংস্কৃতিক দুস্থতা। উপাচার্যদের সাক্ষাৎকারগুলো তাঁদের ভাষণের মতোই রোমহর্ষক। কয়েক বছর আগে এক উপাচার্য মুক্তিযুদ্ধকে বলে 'গণ্ডগোলের সময়'। তিনি যে রাজাকার ছিলেন বা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুক্তিযুদ্ধকে হেয় করতে চেয়েছিলেন, তা নয়' রিকশাওয়ালারা, শ্রমিকেরা মুক্তিযুদ্ধকে 'গণ্ডগোলের সময়'ই বলে থাকে। ওই উপাচার্য আমাদের সরল নিরক্ষর রিকশাওয়ালা ও শ্রমিকদের মতোই নির্দোষ, ও একই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত; তাদের মান এক। এক উপাচার্য গত বছর একটি পত্রিকার সাথে সাক্ষাৎকারে আমার সম্পর্কে এমন একটি উক্তি করেন, যাতে তাঁর সাংস্কৃতিক নিম্নমান সুন্দরভাবে প্রকাশ পায়। আমার যে-লেখা সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেন, আমি বুঝতে পারি তিনি তা পড়েন নি, পড়লেও বোঝেন নি, আমার লেখা তাঁর পক্ষে বুঝে ওঠা খুবই কঠিন। কিন্তু তিনি ব'লে বসেন যে আমার মানসিক হাসপাতালে ভর্তি হওয়া উচিত। মন থাকলে মনের অসুখও হ'তে পারে, তার চিকিৎসার জন্যে মানসিক হাসপাতালেও যাওয়া দরকার হ'তে পারে, প্রয়োজনে আমি সেখানে যেতে কখনোই দ্বিধা বা লজ্জাবোধ করবো না, কিন্তু লজ্জাবোধ করেছি ওই উপাচার্যের সাংস্কৃতিক মানের নিম্নতা দেখে। উপাচার্য হিসেবে তাঁর দায়িত্ব ছিলো বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন লেখক-অধ্যাপকের অধিকার ও সম্মান রক্ষা করা, কিন্তু সাংস্কৃতিক দুস্থতাবশত তিনি যে উক্তি করেন, তাতে বোঝা যায় আমার অনেক আগেই তাঁর ওই চিকিৎসানিকেতনে ভর্তি হওয়া অত্যন্ত জরুরি ছিলো। তাঁর উক্তি অবশ্য আমার উপকার করেছে, আমাকে আরো একটি প্রবচন লিখতে অনুপ্রাণিত করেছে। প্রবচনটি হচ্ছে : আমার এক শুভার্থী আমাকে মানসিক হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন, এবং তিনি যে-কেবিনটিতে দশ বছর ছিলেন সেটিই নিতে বলেছেন। তবে আমি ওই কেবিন নিতে রাজি হই নি, কেননা ওই কেবিনে পাগল হয়ে ঢুকতে হয়, আর ছাগল হয়ে বেরিয়ে আসতে হয়।'

বাঙলাদেশের উপাচার্যদের সাংস্কৃতিক মানের নিম্নতা সম্পর্কে উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণাকেন্দ্র একটি গবেষণা প্রকল্প গ্রহণ করতে পারে।

বাঙলাদেশে উপাচার্যদের পরিণতি অত্যন্ত স্পষ্ট। কয়েক মাস তাঁরা সুখে থাকেন, তারপর শুরু হয় তাঁদের দুঃখের দিন। একদিন দেখা যায় ছাত্ররা তাঁদের ঘেরাও করেছে, বাইরে খুবই রুচিকর শ্লোগান চলছে, উপাচার্যের নামের আগের-পরের সমস্ত উপাধি মুছে দিয়ে ছাত্ররা তাদের এমন নাম ধ'রে ডাকছে, যে-নামে বাল্যকালে কেউ ডাকলেও মারামারি বেধে যেতো কিন্তু ছত্রিশ ঘণ্টা ঘেরাও ও তিরস্কার উপভোগ করতে হয় তাঁদের। কোনো এক শুভদিনে ছাত্ররা হামলা চালায় উপাচার্যদের ওপর, কারো মাথা ভাঙে, কারো হাত ভাঙে, কেউ কেউ নিজের অপমান চেপে যান, কেউ কেউ নিজের অপমান গলায় ঝুলিয়ে রাখেন। ছাত্ররা কখনো কখনো উপাচার্যের ভবনও আক্রমণ করে, আগুন ধরিয়ে দেয় ঘরবাড়িতে। কেউ কেউ অপমান ও প্রাণের ভয়ে পদত্যাগ করেন, অনেকে করেন না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দু-জন উপাচার্য পদত্যাগ করেছেন আক্রান্ত হয়ে, আরেকজন আক্রান্ত হয়েছেন। চট্টগ্রামের একজনকে পদত্যাগ করতে হয়েছে ছাত্রদের চাপে। তাঁদের এ পরিণতিকে ট্র্যাজেডি বলা যায় না, কেননা ট্র্যাজেডির নায়কের কোনো বৈশিষ্ট্য তাঁদের নেই; তাঁদের পরিণতিকে মনে হয় প্রহসন। তাঁরা সবাই প্রহসনেরই নায়ক। তবে পদত্যাগই উপাচার্যদের চরম পরিণতি নয়, আরো পরিণতি রয়েছে। কয়েকজন উপাচার্যকেই যেতে হয়েছে কারাগারে; —চট্টগ্রামের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একজনকে, রাজশাহীর দু-জনকে, ঢাকার একজনকে কারাগার পর্যন্ত যেতে হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ হয়তো বানানো ছিলো, তবে যেগুলো খাঁটি ছিলো, তার জন্যেও কারাগারে না গিয়ে উপায় থাকে না। উপাচার্যদের মধ্যে যারা পদত্যাগ ক'রে মুক্তি পান, তাঁরা ভাগ্যবান; অন্তত কারাগার তাঁদের ক্ষমা করে। প্রশ্ন হচ্ছে দেশের জ্ঞানকেন্দ্রের প্রধান পুরুষদের এ পরিণতি হয় কেনো, এ-পরিণতির সম্ভাবনা এখনো থেকে যাচ্ছে কেনো? এরকম ঘটে মানুষ হিসেবে তারা বড়ো ক্ষুদ্র ব'লে? সরকার তাঁদের ওই পরিণতি দেখতে চায় ব'লে? ছাত্ররা তাদের ব্যবহার করতে চায় ব'লে? তারা বড়ো বেশি ক্ষমতালোভী ব'লে? তারা অধ্যাপকের বেশে ব্যর্থ আমলা ব'লে? প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়েই উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নন; মানুষ ও জ্ঞানী হিসেবে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যের থেকে উৎকৃষ্ট অধ্যাপকের সংখ্যা অনেক। উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন গৌণ অধ্যাপক মাত্র। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পদটি তাঁকে পাগল ক'রে তোলে, পদ আঁকড়ে থাকা, ক্ষমতার অপব্যবহার করা তাঁর রোগে পরিণত হয়। তিনি সততা থেকে ভ্রষ্ট হন, বা আগে থেকেই ভ্রষ্ট, জ্ঞান ও বিদ্যার কথা তার মনে থাকে না, ক্ষমতার লোভে তিনি রাজনীতিতে মেতে ওঠেন; অসংখ্য মিথ্যার জালে জড়িয়ে পড়েন। বাঙলাদেশের একটি বা একজন উপাচার্যও জ্ঞানের কথা ভাবেন না, ভাবেন ক্ষমতা ও রাজনীতি। তাই তাঁদের পরিণতি এমন। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি পণ্ডিত উপাচার্য কামনা করি, যিনি অফিসেও বই পড়বেন, ক্লাশও নেবেন, ক্ষমতায় থাকার সময়ও গবেষণা করবেন। তবে আমাদের উপাচার্যরা ক্ষমতার আসার অনেক আগেই জ্ঞানপর্বকে বিদায় জানান; শুরু করেন জীবনের উন্নতিপর্ব : একদিন উপাচার্য হন, এবং একসময় দেখতে পান নিজের পরিণতি। সেদিন তিনি পদচ্যুত, এমনকি ইতিহাস নিষ্ক্রান্ত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয়

আমার প্রাথমিক বিদ্যালয়টিকে আমার খুব মনে পড়ে। রাস্তার পাশে একটি ভিটের ওপর ছিলো প্রাথমিক বিদ্যালয়টি; তার পশ্চিম ধারে ছিলো কয়েকটি যুগল কবর, পুবে মসজিদ, দক্ষিণে জঙ্গল ও পুকুর। প্রাঙ্গণে ছিলো ধারালো সরু কাঁটাভরা এক রকম ঘাস। বিদ্যালয়টি ছিলো একটি লম্বা ঘর, যার ভেতরে একটা নড়োবড়ো হাতলভাঙা চেয়ার, একটা ভাঙা টেবিল, আর বেড়ার গায়ে একটা রঙচটা ব্ল্যাকবোর্ড ছাড়া আর কোনো আসবাব ছিলো না। বেড়ার গায়ে কাঠ সেঁটে এমনভাবে আমাদের বসার ব্যবস্থা করা হয়েছিলো, যা বর্ণনা করার ভাষা এখনো আমি আয়ত্ত করে উঠতে পারি কি। শীতে হু হু ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকতো ভেতরে; আর বোশেখের প্রথম বাতাসেই আমাদের বিদ্যালয়ের জংধরা টিনের চাল উড়ে গিয়ে আশ্রয় নিতো উঁচু আমগাছটির ডালে। আমাদের দু'জন ক্লান্ত ধূসর শিক্ষক ছিলেন। ওই বিবর্ণ বিষণ্ন বিদ্যালয়ে তাঁরাই আমাকে দিয়েছিলেন সবচেয়ে মৌলিক জ্ঞান। এরপর অনেক প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ, মহা, ও বিশ্ববিদ্যালয় দেখেছি। বাঙলাদেশের বিদ্যালয়ের আদর্শরূপ আঁকা হয়ে গেছে আমার চেতনায়, কোথাও গেলে ওই এলাকার বিদ্যালয়টিকে চিনতে আমার কষ্ট হয় না। ওই এলাকার যে-ভবনটি সবচেয়ে ভাঙাচোরা, যার বেড়ায় দেয়ালে শ্যাওলার প্রবল প্রসাধন, যার এক দিক হেলে আছে বা কোনো অংশের নির্মাণ স্থগিত হয়ে আছে অনেক বছর ধ'রে, যে-ভবনটিকে ওই এলাকার মানুষেরা গভীর অবহেলা করে, যেটিকে দেখলে চোখে মুহূর্তে ছানি পড়ে, আমি বুঝতে পারি সেটি কোনো বিদ্যালয়। বিদ্যাকে আমরা কতো গুরুত্বপূর্ণ মনে করি, বিদ্যালয় দেখলেই তো চিরকালের জন্যে বোঝা হয়ে যায়। থানার দালান ঝকঝক করে, মসজিদগুলো থেকে আলো বেরোয়, বিভিন্ন অফিসের ভেতরে ও বাইরে নানা রকম নবাবি, জরাজীর্ণ শুধু বিদ্যালয়গুলো। আমার প্রাথমিক বিদ্যালয়টির চালে তবু কয়েকটি ঢেউটিন ছিলো; পাশের গাঁয়ের বিদ্যালয়টির তাও ছিলো না। শুকনো বাঁশপাতা দিয়ে ওই বিদ্যালয়ের প্রধান ও একমাত্র শিক্ষক চাল ও বেড়া বানিয়েছিলেন তাঁর বিদ্যালয়ের। ওই দুর্দশাগৃহে যারা জ্ঞানের বাতি জ্বালাতেন, তাঁদেরও মনে পড়ে; এবং মাথা নত হয়ে আসে। যে-গুটিকয় মানুষের কথা মনে হ'লে আমার মাথা নত হয়ে সুখী বোধ করে, আমার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা আছেন তাঁদের শীর্ষে। ওই বয়সে টাকাপয়সার কথা বুঝি নি, আজো বুঝে উঠতে পারি নি; স্যারদেরও যে জীবন চালানোর জন্যে টাকাপয়সার দরকার হতো, তা মনে আসে নি। এখন বুঝি স্যারদের মুখে যে-অক্ষয় ক্লান্তি দেখেছি, তা ছিলো অভাবের ক্লান্তি। ইউনিয়নের প্রেসিডেন্টের মুখে সে-ক্লান্তি ছিলো না, তার বন্ধু বড়ো দারোগার মুখে সে-ক্লান্তি ছিলো না; ওই ক্লান্তি ছিলো শুধু আমাদের স্যারদের মুখে। পরে উচ্চ বিদ্যালয়ের,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহাবিদ্যালয়ের স্যারদের মুখেও দেখেছি একই অক্ষয় ক্লান্তি। আমলার মুখে ওই ক্লান্তি দেখি নি, ব্যবসায়ীর মুখে ওই ক্লান্তি দেখি নি, কালোবাজারির মুখে ওই ক্লান্তি দেখি নি। তাদের মুখ খুবই আলোকিত। এখন আমি যেখানে আছি, তাতে আমার প্রাথমিক বিদ্যালয়টিকে খুব মনে পড়ে। এটা বিশ্ববিদ্যালয়; তবে এর কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই আমার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাথে। এর ভবনে দেখতে পাই আমার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিবর্ণতা; আর শিক্ষকদের মুখে দেখতে পাই আমার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মুখের অক্ষয় ক্লান্তি। প্রাথমিক বিদ্যালয় আর বিশ্ববিদ্যালয় একই সামাজিক রাজনীতির নিয়তির ক্রোধে দণ্ডিত যুগল সহোদর।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন খুবই বিখ্যাত; এটি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীক। বাইরে থেকে বেশ মনে হয় দালানটিকে, কিন্তু এটিও আমার প্রাথমিক বিদ্যালয়টির মতোই। একেবারে আমার প্রাথমিক বিদ্যালয়। আমার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রঙচটা ব্ল্যাকবোর্ডটি কীভাবে যেনো এসে সেঁটে আছে কলাভবনের ক্লাশকক্ষের দেয়ালে। আমি ঠিক চিনতে পারি—একই ব্ল্যাকবোর্ড—সেটিতে চকের দাগ পড়তো না, এটিতেও পড়ে না। আর ওই হাতলভাঙা, পাভাঙা চেয়ারটি—ওটিও আমার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছিলো। হেডস্যার বসতেন, বসতে বসতে একেবারে ধ'সে গেছে। তারপর ওটি চ'লে এসেছে কলাভবনের ক্লাশকক্ষে; এখন ওটিতে বসাও যায় না। আমার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাখা ছিলো না, তবে এর চেয়ে ভালো বাতাস ছিলো। উত্তর আর দক্ষিণ থেকে বাতাস ঢুকতো। কলাভবনের ক্লাশকক্ষগুলোতে অনেক পাখা টাঙানো আছে, কোথা থেকে এসেছে জানি না; তবে আমার প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে আসে নি। সেখানকার প্রাকৃতিক পাখা এতো খারাপ ছিলো না। এগুলোর কোনোটা ঘোরে, কোনোটা অটল; কোনোটি ট্রাকের বংশধর, কোনোটি রেলগাড়ির, কোনোটি অশ্বের। এরা যখন গতিশীল হয়, তখন মহাপ্রলয়ের ধ্বসি জাগে। আমার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক কোণে দুটি চড়ুই ছিলো; সেগুলোও চ'লে এসেছে কলাভবনে। ছাত্ররা যখন শ্লোগান থেকে বিরত থাকে তখন ওই রাজনীতিপ্রবণ চড়ুই দুটি তাদের শ্লোগান শুরু করে। যাঁদের কমপক্ষে দশ বছর যাত্রাভিনয়ের অভিজ্ঞতা নেই, তাঁরা কলাভবনের ক্লাশকক্ষে পড়ানোর অযোগ্য। বক্তৃতাভবন ব'লে একটি নতুন দালান হয়েছে ক-বছর আগে। ওটা আমার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের থেকেও নিকৃষ্ট। এটির স্থপতিরা অর্থচিন্তাশীল ছিলেন, শিক্ষাচিন্তাশীল ছিলেন না। প্রথম দিনেই ওই ভবনের অসংখ্য আসন বিকলাঙ্গ হয়ে যায়, ব্ল্যাকবোর্ড নিজের কালিমা ঘুচিয়ে ফরশা হয়ে ওঠে; বাথরুম আবর্জনাস্থলে পরিণত হয়। কারো এদিকে চোখ নেই। কর্তাদের বাড়ির দেয়াল নিয়ে প্রশাসক ও প্রকৌশলীরা বছরপরম্পরায় ব্যস্ত; কিন্তু কলাভবনের হাস্যকর মঞ্চ, বিকলাঙ্গ চেয়ার, নড়োবড়ো ডায়াস, বসার অযোগ্য বেঞ্চ, ও পাখার কর্কশ কোরাস কাউকে বিচলিত করে না। আমার প্রাথমিক বিদ্যালয়ও কাউকে বিচলিত করতো না। নিয়তি আমাকে এক প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে আরেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিয়ে এসেছে। চারদিকে ঝকঝকে কতো কিছু দেখি। মন্ত্রণালয়গুলো বিলাসগৃহের মতো, ব্যাংক প্রমোদশালার প্রতিদ্বন্দ্বী, আমলাদের কক্ষে কোমল কার্পেটের আবেদন, থানাগুলো ঝকঝকে, কারো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কারো জুতো আয়নার থেকেও মসৃণ, এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসকদের কক্ষগুলোও নয়নাভিরাম; অবহেলিত শুধু বিদ্যার এলাকাটি। কলাভবনে আমার প্রাথমিক বিদ্যালয়কে ফিরে পেয়ে কী যে সুখ লাগে আমার!

তারপর মুখের সেই অক্ষয় ক্লান্তি! যে-ক্লান্তি দেখেছিলাম আমার স্যারদের মুখে, তাই দেখতে পাই কলাভবনের শিক্ষকদের মুখে। আমার মুখেও লেগে আছে একই ক্লান্তি। আমরা ধরেই নিয়েছি শিক্ষকদের কোনো পার্থিব চাহিদা নেই। একজন কেরানিও বিশাল কক্ষে কার্পেট ছড়িয়ে কোমল আসন আলোকিত ক'রে বসেন, দূরালাপে ব্যস্ত থাকেন দূরালাপনীতে; কিন্তু একজন শিক্ষকের নিজের কোনো কক্ষের দরকার নেই, তিনচারজন একসাথে বসলেই তাঁদের চলে। আর দূরালাপনী—তা আমার প্রাথমিক শিক্ষকের ছিলো না, তাই এখানেও থাকতে পারে না। তৃতীয় শ্রেণীতে পাশ করে তারা যদি কেরানি হতেন, তাহলে পেতেন; প্রথম শ্রেণী পেয়ে শিক্ষক হয়েছেন বলে, ওসব তাঁদের প্রাপ্য নয়। তাঁরা শিক্ষক, তাই তারা থাকবেন বস্তিতে। আমার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক অনেক ভাগ্যবান ছিলেন; তাদের বস্তিতে থাকতে হয় নি; তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বস্তিতে থাকতে হয়। সৎ মানুষের ভালো জায়গায় থাকা পাপ। চোরাচালানিরা থাকবেন গুলশানে, বারিধারায়; উৎকোচস্ফীত আমলারা থাকবেন সুন্দর জায়গায়; শিক্ষক থাকবেন বস্তিতে। তাঁরা যাতায়াত করবেন কীভাবে? হাঁটবেন, নইলে বাসে চড়বেন। গাড়িতে চড়বেন অন্যরা। প্রথম শ্রেণী পেয়ে শিক্ষক হ'লে এটা তো স্বীকার করতেই হবে। প্রথম শ্রেণী পাওয়া ওই তরুণ প্রভাষকটি, তিনি যদি দারোগা হতেন, তাহলে বেশ থাকতেন; কতো কিছু এরই মাঝে হতো তাঁর। কিন্তু শিক্ষক হওয়ার শাস্তি তাঁকে পেতেই হবে। বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে কাস্টমসে চ'লে গেলো যে যুবকটি, তাকে প্রশংসা করি; সে বুঝে ফেলেছে বিদ্যা ও জীবনের মর্মকথা। বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা গৃহশিক্ষকতা ক'রে টাকা রুজি করছেন, ভালো থাকছেন; এটা সহ্য হচ্ছে না আমলাদের। শিক্ষকেরা কেনো ভালো থাকবেন? কেনো বাড়ি করবেন? কেনো গাড়ির স্বপ্ন দেখবেন? শিক্ষকদের যদি পুরোপুরি বস্তির অধিবাসী করে না তুলতে পারি, তাহলে আমাদের সমাজরাষ্ট্র এগোবে কেমনে? শিক্ষকেরা ঘুষ খেতে পারছেন না, তাই ভালো থাকতে পারছেন না। এ-সমাজে অবৈধ আয় ছাড়া ভালো থাকা অসম্ভব। চারপাশে শিক্ষকদের মুখের দিকে তাকিয়ে, নিজের মুখ আয়নায় দেখে, আমার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মুখ মনে পড়ে। একই ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মুখ মনে পড়ে। একই ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয়। তারপরও চাই বিদ্যা, মৌলিক বিদ্যা, বিদ্যার উন্নতি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জনগণের মদ্য

মার্ক্স জনগণের আফিমের কথা বলেছেন, মদ্যের কথা বলেননি। জনগণের মদ্য চোলাইয়ের যে-কলটি আবিষ্কার করেছিলেন এডিসন, মার্ক্স তার বিশ্বজনীন উৎপাদন দেখে যান নি। ওই মহাআবিষ্কারক উদ্ভাবন করেছিলেন এমন এক অভিনব কল, যেটি উৎপাদন করে চলছে জনগণের প্রিয়তম মদ্য, যার নাম সিনেমা। বিশশতক বিশ্বযুদ্ধ ও বিনোদনের শতাব্দী এ-শতকের মানুষ বস্ত্র ছাড়া চলতে পারে, অস্ত্র ছাড়া পারে না; এ-শতকের মানুষ ভাত ছাড়া বাঁচতে পারে, বিনোদন ছাড়া পারে না। বিনোদন ব্যবসা এ শতকের মহত্তম ব্যবসা। বিজ্ঞানের চোখে ঘুম নেই বিনোদনের কথা ভেবে ভেবে; প্রতিদিনই কিছু-না-কিছু আবিষ্কৃত হচ্ছে এ-দুঃখী গ্রহের দুঃখী অধিবাসীদের চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে। জনগণের রক্তমাংসচিত্ত বিনোদনে সিনেমা মদ্যটি এখনো অপরাজিত; পৃথিবী জুড়ে ধনীরা, বিশেষ করে গরিবেরা প্রাণ ভ'রে পান ক'রে চলছে এ পানীয়টি। একে গরিবদের পানীয়ও বলা হয়। সিনেমাকে জাতে উঠতে সময় লেগেছে, সম্ভবত আজো পুরোপুরি জাতে উঠতে পারে নি। অনেকে আজো একে বলেন 'ব্যাড আর্ট' বা 'অপশিল্পকলা'। জাতে ওঠার জন্যে এটি নিজের নাম বদলিয়ে ঘন ঘন বায়োস্কোপ, মুভি, টকি, ফিল্ম, সিনেমা প্রভৃতি নাম নিয়েছে; তবে যে-নামই নিয়েছে সেটিই কিছু দিনের মধ্যে মহিমা হারিয়েছে। অচিরেই হয়তো পাওয়া যাবে এর কোনো নতুন নাম। বাঙলায়ও ঘটেছে একই ঘটনা; —বই, ছবি, ছায়াছবি নানা নামে ডাকা হয়েছে একে, তবে এর আসল উপভোগীরা এক সিনেমাই বলে, যদিও অনেকে একে শিল্পটির গণ্য ক'রে বলেন 'চলচ্চিত্র'। এর একটি বিশেষণ খুব শোনা যায়; বলা হয় একটি একটি শক্তিশালী মাধ্যম। শক্তিশালী শব্দটি আজকাল সন্দেহজনক; শক্তি বিশশতকে বিভীষিকাই বেশি সৃষ্টি করেছে।

সিনেমা পরনির্ভর মাধ্যম; যখন সিনেমা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে চেয়েছে, তখনি তা নির্ভর করেছে উৎকৃষ্ট সাহিত্যের ওপর। ভালো সিনেমা ভালো সাহিত্যের ভিন্ন মাধ্যমে স্থানান্তর বা উপস্থাপন। পথের পাঁচালীকে চলচ্চিত্রিত করলে পথের পাঁচালীই থাকে; এবং থাকে বিভূতিভূষণেরই। চ্যাপলিন ও আরো দু-একজন ছাড়া প্রধান চলচ্চিত্রকাররা সবাই মহৎ লেখদের অধমর্ণ। মহৎ সাহিত্যের চলচ্চিত্রন দেখলে বোঝা যায় সাহিত্য স্রষ্টারা কতো বড়ো বিখ্যাত পরিচালকদের থেকে। তৃতীয়-চতুর্থ মানের লেখকেরাও অনেক বেশি প্রতিভাবান প্রথম মানের পরিচালকদের থেকে। চলচ্চিত্র থেকে মহৎ সাহিত্যসমূহ সরিয়ে নিলে যা থাকে তা নিয়ে অর্থ খ্যাতি শক্তির গৌরব করা চলে তবে মহত্ত্ব ও শিল্পকলার গৌরব করা চলে না। শুরু থেকেই সিনেমা উপভোগীদের কয়েকটি বিশেষ রিপুর পরিতোষ যোগাতে চেয়েছে; আজো যুগিয়ে চলছে পুরোদমে। যদি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনো একটি উপাদানকে সিনেমার প্রধান লক্ষণ ব'লে চিহ্নিত করা হয়, তাহলে সেটি হবে যৌনতা বা যৌনাবেদন। সিনেমার জগতটি ওই তীব্র প্রবল আবেদন দিয়ে মোড়া। ছবির ভেতরে আছে ওই আবেদন; আর বাইরে তো ওটিই প্রবল। সিনেমা নিয়ে যে-সব পত্রপত্রিকা বেরোয়, তাতে ওই আবেদন; অভিনেতাঅভিনেত্রীদের শরীর ও পোশাক জুড়ে ওই আবেদন। সিনেমা একমাত্রিক পদ্ধতি ব'লে জনগণের উপভোগের জন্যে সবচেয়ে সহজও। বই পড়তে হয়, বুঝতে হয়, উপলব্ধি করতে হয়; আর সিনেমা শুধু দেখলেই চলে। তাই এটিই হয়ে উঠেছে জনগণের মদ্য।

যে-অঞ্চলে জীবন দুর্দশাগ্রস্ত আর সামাজিক বিনোদনের কোনো উপায় নেই, সেখানে সিনেমাই অবদমিত কামনাবাসনা পরিতৃপ্তির সহজ উপায়। ভারতীয় উপমহাদেশটি এর এক আদর্শ এলাকা। এখানে অধিকাংশ মানুষের খাদ্য, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা কিছু নেই। বাস্তব জীবন এখানে অধিকাংশের জন্যে নরক। তারপর রয়েছে অন্যান্য প্রবৃত্তি। মানুষ কোনো-না-কোনো নেশা চায়, যা তাকে সজীব করতে পারে। খাদ্য এখানে নেই, পানীয় তো স্বপ্নের বস্তু; তার ওপর নিষিদ্ধ। নারীপুরুষ পরস্পরের কাছাকাছি আসতে চায়, এটাই মানবিক স্বভাব। এ-অঞ্চলে তার সুযোগ নেই। এ-অঞ্চলের মানুষ ক্ষুধাতৃষ্ণা ও অবদমিত জৈব কামনাবাসনার সমষ্টি। তাদের কোনো ক্ষুধাই মেটেনি কোনো তৃষ্ণাই শীতল হয় নি। তাই এ অঞ্চলে পাশবিকতার এমন ছড়াছড়ি। এ-অঞ্চলের সিনেমার পুঁজি এখানকার মানুষের ক্ষুধাতৃষ্ণা ও অবদমিত কামনাবাসনা। হিন্দি সিনেমা এ-পুঁজিটাকে ব্যবহার করে সবচেয়ে বর্ণাঢ্যভাবে; আর ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কামনায় বাসনায় পীড়িত মানুষেরা ওই মদ আকণ্ঠ পান করে। হিন্দি সিনেমার নায়িকাদের দেহকাঠামো ওই ক্ষুধাতৃষ্ণা কামনাবাসনার পরিতৃপ্তি জন্যে আদর্শ কাঠামো। হিন্দি নায়িকারা স্থূলাঙ্গী হয়ে থাকে;—তাদের শরীরে প্রচুর মাংস, অসংখ্য বাঁক, বিশাল বক্ষ ও প্রশস্ত পশ্চাদ্দেশ থাকতে হয়। ওই নায়িকা দর্শকদের খাদ্য ও পানীয়। ক্ষুধার্ত মানুষেরা প্রচুর খেতে চায়, ক্ষুধার্ত দর্শকেরাও চায় এমন নায়িকা, যার দেহ তারা কল্পনায় পেট ভ'রে খেতে পারে। সাধারণত দরিদ্র দর্শকেরা শীর্ণ নায়িকা পছন্দ করে না, কারণ তার দেহে মাংস নেই; ওই নায়িকা তাদের ক্ষুধা ও কামনা পূরণ করতে পারে না। সে-নায়িকাই এক নম্বর, যাকে কোটি কোটি বুভুক্ষু খেয়ে শেষ করতে পারে না। তারা নায়িকার শরীরে খোঁজে সমস্ত ক্ষুধার পরিসমাপ্তি। হিন্দি সিনেমায় নাচগুলো হচ্ছে বিকল্প যৌনমিলন। এ-সব সিনেমায় নায়িকারা আড়াই ঘণ্টায় আড়াই মাইল দৌড়োয়, নায়ক দৌড়োয় দু-মাইলের মতো। তাদের বিভিন্ন প্রত্যঙ্গকে আন্দোলিত করতে হয় দশ বারো হাজার বার। একটি সিনেমায় নায়িকা বক্ষ ঝাঁকুনি দেয় পাঁচ হাজার বার, পশ্চাদ্দেশ আন্দোলিত করে ছ-হাজার বার, কাম প্রকাশ করে কয়েক শো বার আর ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত দর্শকমণ্ডলির ঘটতে থাকে কামনার মোক্ষণ। তবে পুরোপুরি ঘটে না। পশ্চিমে প্রকাশ্য চুম্বন প্রভৃতি দর্শককে হালকা ক'রে তোলে, কিন্তু এ-অঞ্চলে জীবনের মতো সিনেমায়ও ক্ষুধাতৃষ্ণাকামনাকে বিকট খলে নেড়ে তৈরি করা হয় এক বিষাক্ত কামনাজাগানো পাচন। এ-পাচন যে-ছবিতে সবচেয়ে কড়াভাবে তৈরি হয় সেটির জন্যেই পাগল হয়ে ওঠে জনগণ। এসব ছবিতে যে-কাহিনী থাকে, তা তুচ্ছ;

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবে ওই কাহিনীতেও জনগণের ইচ্ছাপূরণের চেষ্টা থাকে। বহু বছর আমি ছবিঘরে গিয়ে সিনেমা দেখি নি। বছর বিশেক আগে একটি ছবি শুরু হতে-না-হতেই যে ছবিঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম, তারপর ঢাকার কোনো ছবিঘরে ঢুকিনি। বাধ্য হয়ে এবার একটি ছবি দেখতে হলো। ছবিটি কেনো চলছে? এটিতে আছে ক্ষুধার্তের তৃষ্ণার্তের ক্ষুধাতৃষ্ণা মেটানোর চেষ্টা। অত্যন্ত নিম্নমানের এ-ছবি, কিন্তু প্রথম তিরিশ মিনিট পর্দা জুড়ে নায়িকার বিশাল শরীর খুলে খুলে দেখানো হয়েছে। নায়িকার সম্মুখ, পশ্চাৎ, উর্ধাঙ্গ, নিম্নাঙ্গ এমনভাবে পরিবেশন করা হয়েছে যে গোগ্রাসে গেলা যায়। এর যা কাহিনী, কোনো অপন্যাসিকও তা লিখতে রাজি হবে না। তবে পরিচালক বানিয়েছেন এমন এক মদ্য, যা জনগণ গোগ্রাসে পান করলে তাদের দোষ দেয়া যায় না। তাদের জীবনে কোনো কামনারই পরিতৃপ্তি ঘটে নি, কোনো ক্ষুধাই তাদের মেটেনি, এমন মাংসল কাউকে তারা কখনো আলিঙ্গনে পায় নি এ-ছবি তাদের তা দিয়েছে। রাষ্ট্র ও সমাজ তাদের যা কখনো দেবে না, এ-সিনেমা দিয়েছে তাদের সে-মদ্য; তা তারা পান ক'রে চলেছে দেশ জুড়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঙালির মগজ, বাঙলা ভাষা ও পরীক্ষা খাতা

এক মার্কিন লেখক বলেছেন যে শতকরা নব্বইজন মানুষই যুক্তিসঙ্গত, সুশৃঙ্খল চিন্তা করতে পারে না; আর ভাষা যেহেতু চিন্তার প্রকাশ, তাই তাদের পক্ষে সুশৃঙ্খল শুদ্ধ বাক্য লেখাও অসম্ভব। পশ্চিমের বিদ্যালয়গুলোতে বেশ যত্নের সাথে শেখানো হয় কীভাবে লিখতে হয় শুদ্ধ, সুশৃঙ্খল, ব্যাকরণসম্মত বাক্য; কিন্তু অধিকাংশ ছাত্রই লিখে থাকে নিকৃষ্ট বাক্য। ওইসব বাক্যে যে ভুল শব্দ ব্যবহৃত হয়, কর্তাক্রিয়ার সঙ্গতি নষ্ট করা হয়, তাই সব নয়; ওই সব বাক্যে যে-চিন্তার প্রকাশ ঘটে, সে-চিন্তাই ব্যাধিগ্রস্ত। লেখক জানে না সে কী বলতে চায়, সে জানে না কোন শব্দের সাহায্যে সে বলতে পারে তার মনের কথা। তাই তার লেখা হয়ে ওঠে ব্যাধিগ্রস্ত; ভাষা হয়ে ওঠে দূষিত। পশ্চিমের সমাজবিজ্ঞানী, অর্থবিজ্ঞানী, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও অন্য বিজ্ঞানীরা সরল ভাষায় কথা না ব'লে ব্যবহার করেন অসংখ্য নিরর্থক জার্গন; তাতে বেশ গালফোলা ভাব প্রকাশ পায়, মনে হয় যেনো খুবই গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য বেরোচ্ছে; তবে হিসেব নিলে দেখা যায় ভেতরে বিশেষ বক্তব্য নেই। অরওয়েল এমন ভাষার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। বাইবেলের একটি অসামান্য বক্তব্যকে জার্গনভরা ভাষায় প্রকাশ করলে কেমন হাস্যকর হয়ে ওঠে, অরওয়েল তা দেখিয়েছিলেন। দূষিত চিন্তা ভাষাকে দূষিত করে। রাজনীতিক কপটতাও ভয়াবহভাবে দূষিত করে ভাষাকে। স্বৈরাচারী ব্যবস্থায় কেমন ভাষা ব্যবহৃত হ'তে পারে, আর তাতে বাস্তব জগত হয়ে উঠতে পারে কতোটা অবাস্তব অরওয়েল তার বিভীষিকাজাগানো বিবরণ দিয়েছেন 'নিউস্পিক' নামক এক বিস্ময়কর ভাষারীতি তৈরি করে। স্টেইনার দেখিয়েছেন হিটলারের জর্মানিতে স্বৈরাচার ভাষাকে কতোটা দূষিত, নিরর্থক ও নিষ্প্রাণ করে তুলেছিলো। নাটশিরা উদ্ভাবন করেছিলো 'চূড়ান্ত সমাধান'-এর মতো শব্দ, যার আক্ষরিক অর্থটি বেশ ভালোই মনে হয়; কিন্তু আসল অর্থ হচ্ছে ছয় লক্ষ মানুষকে গ্যাসের চুলোয় পুড়িয়ে মারা। সুভাষণ এখন রাজনীতিকদের খুই প্রিয়; তাতে কালোকে রঙিন ব'লে প্রচার করা যায়। অনুন্নতকে 'উন্নয়নশীল' বললে বেশ চমৎকার লাগে, শক্তিহীনদের 'ক্ষমতার উৎস' বললে বুক ভ'রে যায়, ভৃত্যকে 'মন্ত্রী বললে মর্যাদার সীমা থাকে না। তোষামোদ করার জন্য সুভাষণ ব্যবহার করতে হয় অনবরত। নির্বোধকে 'ধীরমেধাসম্পন্ন', একনায়ককে 'ত্রাণকর্তা', স্বাধীনতাযুদ্ধে অনুপস্থিত ব্যক্তিকে 'স্বাধীনতা সংগ্রামের অবিসংবাদিত নেতা' বললে সুখশান্তিতে সময় কাটে। ভাষা প্রয়োগে যে-সমস্ত সাধারণ ত্রুটি ঘটে, সেগুলো কিছুটা যত্ন নিলে এড়ানো সম্ভব হয়; কিন্তু যেখানে গোলমাল ঘটে চিন্তায় সে-ত্রুটি কাটানো কঠিন। কারণ তাতে দরকার পড়ে মগজের চিকিৎসা। মগজকে সুস্থ ক'রে তোলা, তাকে সুশৃঙ্খল চিন্তায় শিক্ষিত ক'রে তোলার প্রক্রিয়া এখনো আবিষ্কৃত হয় নি। যারা বুঝতেই পারে না কী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলতে চায় তারা, যাদের চিন্তা জটপাকানো, যারা শব্দগুলোকে যথাযথ অর্থে অনুভবই করে না, তাদের পক্ষে সুস্থ বাক্য লেখা অসম্ভব। বাঙালির মগজ যে সুস্থ নয়, তারা যে বক্তব্য ঠিকমতো বিন্যস্ত করতে পারে না, এবং পারে না ওই বক্তব্যকে যথাযথ শব্দে প্রকাশ করতে, তা বোঝা যায় বাগ্মীদের বক্তৃতা শুনলে, সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রিকাগুলো উল্টোলে, এবং চারপাশে যে-সব জ্ঞান ও সাহিত্যের বই চলছে, সেগুলো পড়লে। পুরোপুরি নির্ভুল লেখা আজকাল আর চোখে পড়ে না। একটি পুরোপুরি শুদ্ধ বাক্য শোনা এখন দুর্লভ ঘটনা। 'সাতদিন থেকে বৃষ্টি হচ্ছে', 'বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলে'ন, 'পরবর্তীতে' খুবই চলছে, এমনকি 'মাতার ঔরসে'ও দেখেছি একটি পত্রিকায়। বাগাড়ম্বর করে চলছে সবাই, শুধু খেয়াল নেই শব্দ ও বক্তব্যের দিকে। এক পাঠক লিখেছেন, 'প্রবন্ধে চমৎকার শব্দচয়ন, হৃদয়স্পর্শী মূল্যবোধ, শৈল্পিক অলংকারায়ন, অন্ন ও আশ্রয়হীন শিশুর প্রতি প্রচণ্ড মমত্ববোধ বাস্তবিক অর্থেই সাম্যবাদী সমবেদনায় বিদগ্ধ।' খুবই গালভরা কথা; কিন্তু শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দূষিত ও নিরর্থক মূল্যবোধ কীভাবে হৃদয়স্পর্শী হয়, বোঝা কঠিন; এবং আরো কঠিন 'সমবেদনায় বিদগ্ধ' হওয়া। শব্দে যথাযথ অর্থও অধিকাংশ বাঙালি জানে না। টেলিভিশনের 'অংকুর একদিন হবে কিশলয়' গানটির কথাই ধরা যাক। অংকুর একদিন কিশলয় হবে, শুনতে বেশ; কিন্তু শুধু কিশলয় হওয়াই লক্ষ্য? কিশলয়-এর অর্থ নতুন পাতা'; কিন্তু গানটি বোঝায় অংকুর একদিন মহীরূহ হবে। গানটি শুনে এখন কিশোরকিশোরীরা মনে করে কিশলয়ের অর্থ বিশাল গাছ। এভাবেই দূষিত হয়ে পড়ছে বাঙলা ভাষা; কারণ বাঙালির মগজই এখন দূষিত।

পরীক্ষার খাতায় পাওয়া যায় বাঙালির মগজের মর্মস্পর্শী প্রকাশ। বানান ভুলের কোনো শেষ নেই, বক্তব্যের কোনো ব্যাকরণ নেই, বাক্যের কোনো রূপ নেই—এ হচ্ছে পরীক্ষার খাতা; অধিকাংশ খাতা। পরীক্ষার খাতা দেখা হচ্ছে চিন্তার নর্দমায় সাঁতার কাটা বক্তব্যকে কতোটা অভাবিত, বাক্যকে কতোটা অসম্ভব বিকৃত এবং ভাষাকে কতোটা নিরর্থক করা যায়, তা দেখতে হলে পরীক্ষার খাতার কাছে আসতে হবে। কারো পক্ষে ইচ্ছে করে এতোটা বিকৃত বাক্য লেখা অসম্ভব, যেমন অসম্ভব এতোটা অস্বাভাবিক চিন্তা করা। এগুলো দেখেই বুঝতে পারি ওই যে চমৎকার জিনসপরা যুবকটি তার মগজে কী আছে; আর ওই যে লিপস্টিকরাঙানো যুবতীটি, তার মগজে কী ঘটছে। 'সোনার তরী' কবিতা সম্পর্কে এক পরীক্ষার্থী লিখেছে, 'রবীন্দ্রনাথ অনেক ধান বুনিয়াছেন, কিন্তু তাহার সমস্যা হইলো কবির কোনো নাও নেই।' খুবই মৌলিক কাব্যসমালোচনা। অনার্স পরীক্ষার্থী একজনের এমন একটি খাতা পেয়েছিলাম যেটি তুলনাহীন। তার পাতায় পাতায় সোনা ছড়ানো। কিছুতেই বোঝা যাবে না তার মাথা থেকে কীভাবে এসব বস্তু উৎসারিত হয়েছে। তার খাতাটি থেকে আমি বেশ কিছু উদ্ধৃতি দিতে চাই, কারণ পুরো খাতাটিই উদ্ধৃতিযোগ্য। পরীক্ষার্থী লিখেছে, 'কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র গৃহদাহ উপন্যাসের অপূর্ব সৃষ্টি। নায়ক চরিত্র অবলম্বনে মহিম ও সুরেশ প্রধান। সমসাময়িকভাবে নায়ক-নায়িকার প্রগাঢ় ভক্তি ও সহিষ্ণুতার বলে গৃহদাহ উপন্যাসখানি লিখে লেখক যশস্বী হয়েছেন।' সে আরো লিখেছে, 'মহিমা তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভালোবাসার প্রতি স্নেহবশত সুরেশকে দিয়ে অচলার সান্নিধ্য লাভ করিয়েছে। অচলা দুর্বল হলেও ভালবাসা তাকে বিসর্জন দিতে পারে নি।' সে আরো লিখেছে, 'প্রেম চিরন্তন। ইহা জলে ডুবে না। প্রেমের মাধুরী মিশিয়ে লেখক এই দুই বিরোহীর জীবন রচনা করেছেন।' অবরোধবাসিনী সম্পর্কে সে লিখেছে, 'নারীরা বেগানা পুরুষদেরকে দেখা দিত না বলেই সে যুগের মুসলিম সমাজ বঙ্গ ভারতে এক অন্যতম প্রতিভার সৃষ্টি করে। রাজদরবারেও বেগম রোকেয়া স্মরণীয় হয়ে আছেন।' সধবার একাদশী সম্পর্কে সে লিখেছে, 'নাট্যকার এ নাটকটি লিখে সধবার একাদশীতে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। কবি মানসলালিত এই নাটকটি দীনবন্ধু মিত্রের হাস্যরসাত্মক এক অপরূপ সৃষ্টির সার্থকতা।' সে আরো লিখেছে, 'নাটক ও প্রহসন লিখে দীনবন্ধু মিত্র সধবার একাদশীতে তার উজ্জ্বল প্রাণমনের সন্ধিহান করেছেন। দীনবন্ধু মিত্রের সধবার একাদশী কার দোষে দোষী। এ কথার তুলনা করা বিরল।' এ-ধরনের অলোকসামান্য উক্তি ব্যাখ্যা ভাষ্যে খাতাটি পুরিপূর্ণ। আমি এ-অসামান্য পরীক্ষার্থীর অপূর্ব মগজের ঘ্রাণ নেয়ার জন্যে দূরপাল্লার একটি টিকেট প্রায় কিনে ফেলেছিলাম; এখন দুঃখ হয়, কেনো যাই নি; কোটি টাকার মাথাটি কেনো দেখে আসি নি।

স্নাতক পরীক্ষার্থীদের কিছু খাতা দেখলাম সম্প্রতি। ওই সব খাতায় যে-বানান, ভাষা আর বক্তব্য, তা অলৌকিক। এগুলো দেখে মনে হয় শুদ্ধ বানান ব'লে কিছু নেই, বক্তব্য ব'লে কিছু নেই। রবিন্দ্রনাথ, শাধিনতা, রায়ত্ত-সাশন, পূয়া, হড়প্রাসাধ-এর মতো অভিনব বানান, আর 'কবিগুরু শুকান্ত ভট্টাচার্য', বিশ্বকবি নজরুল ইসলামের' মতো ভবিষ্যতের সাহিত্যসভার প্রধান অতিথির উক্তিতে এগুলো পূর্ণ। একজন লিখেছে, 'ভাশা হইচ্ছে মানুষের মূখজবানী'। আরেকজন লিখেছে, 'হুজুর কেবলা রাত্রি হইলেই নারী জাতির জন্য বেশি আসক্ত হইতেন। বিশেষ করিয়া রূপবতী মহিলা দেখলে যৌন আসক্তে খুবই মশগুল থাকিত'; আরেকজন লিখেছে, 'একটি পল্লীগ্রামে জীবনব্যবস্থা কিভাবে বিশৃঙ্খলা হয়ে গেল তারই আলেখ্যে সামশুদ্দীন আবল কালামের পথ জানা নেই গল্প হইতে আলোচনা হয়।' একজন লিখেছে, 'ক্ষুধিত পাশান গল্পে ক্ষুদার জালায় মানুষ কেমন পাষাণ হইয়ে যায় তাহার একটি ছায়াচিত্র আলোচনা করা হইয়াছে'; আরেকজন 'একুশের রাজনৈতিক চেতনা সম্পর্কে লিখেছে, 'তাই প্রতি বৎসর রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে প্রতি বৎসর ঐ দিনে কেন্দ্রিয় শহীদ মিনারে সমাবেশ তাদের আত্মার রুহের মাগফেরাত কামনা করে বারংবার নিজেদের রাজনৈতিক চেতনাকে জাগরিত করে'; এবং 'ক্ষুধিত পাষাণ' সম্পর্কে একজন লিখেছে, 'পৃথিবীর এই লিলাময় ভুবনের পরিবর্তনকে রবিন্দ্রনাথ ঠাকুর ক্ষুদিত পাষাণে উল্লেখ করিয়াছেন যে মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জিব অতচ এই মানব জাতীয়ই সব প্রানির চেয়ে নিষ্টুর এবং পাষাণ।' আরেকজন লিখেছে, 'ক্ষুধিত পাশাণ গল্পে ক্ষুধার জ্বালায় যে মানুষ সব কিছু করিতে বাধ্য থাকে কবি শাসক ও শোশক শ্রেণীর প্রতি লক্ষ রেখে 'ক্ষুধিত পাসান' গল্পটি মূল্যায়ন করিয়াছেন'। ভিক্ষুকের জীবন' সম্পর্কে একজন লিখেছে, 'আমাদের প্রত্যেকের উচিত আমরা যারা স্বচ্ছল ব্যক্তি তারা যেন ভিক্ষুককে দেখে হিংসা করি না। ভিক্ষুকের জীবনে যে আত্মা আছে আমাদের প্রত্যেকের সেই আত্মা দিয়ে সৃষ্টি।' বিভিন্ন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাগধারা দিয়ে তারা যে-সব বাক্য লিখেছে, সেগুলোও চিরস্মরণীয়। 'কাকজ্যোৎস্না' দিয়ে একজন বাক্য রচনা করেছে, 'করিম ভালবেসে এক মহিলাকে বিবাহ করে তার চেহারা যেন কাকজ্যোৎস্না'; আরেকজন লিখেছে, 'রহিম কি যে লিখল যেন কাকজ্যোৎস্না', আরেকজন লিখেছে, 'তুমি আমার সাথে মিথ্যা কথা বলে কাকজ্যোৎস্না মেরেছো' আর উদাহরণ দিতে চাই না। এগুলো থেকে কি বুঝতে পারি না সম্ভাব্য এ-স্নাতকদের মগজ পুরোপুরি প'চে গেছে? তারা হয়তো বিএ পাশ করবে, কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে মাধ্যমিক পাশ করলো কী ক'রে? বিসিএস-এর খাতাও দেখেছি একই রকম অবস্থা। পচা মগজের গন্ধে ভরপুর সে-সব খাতা। সংবাদপত্রেও দেখি নিউজপ্রিন্টের গন্ধ ছাপিয়ে ওঠে পচা মগজের সুঘ্রাণ, চাররঙা প্রচ্ছদের বইও পড়ি, সেখানেও একই সুগন্ধ। বাচাল মুদ্রাযন্ত্র এখন অক্লান্ত ছেপে চলেছে বাঙালির পচা মগজ; ও তার দুর্গন্ধ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা

যে-দেশের রাজনীতি ও রাষ্ট্রযন্ত্র রুগ্ন, তার বিশ্বদ্যালয় সুস্থ হবে, এমন আশা করা সম্ভবত এক ধরনের অসুস্থতা, যদিও তাকে বলতে পারি মহান অসুস্থতা। বারো কোটি মানুষের দেশে সাধারণ বিশ্বদ্যালয় আছে মাত্র চারিটি; তার মাঝে দুটিকে শুরু থেকেই অসুখে ফেলে রাখা হয়েছে, যে-অসুখ সারতে একশো বছর লাগবে। রাষ্ট্রযন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশেষ দরকারিও মনে করে না; মনে করে নিজেদের জন্যে ক্ষতিকর, তাই দেশে বিশ্ববিদ্যালয় বাড়ে না; বেড়ে চলে সৈন্যাবাস, যা তাদের জন্যে খুবই উপকারী। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় জর্জরিত অজস্র সমস্যায়;—সমস্ত সমস্যার মূলে একটিই সমস্যা, অর্থ, যার অভাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ভুগছে পঙ্গুত্বে। গরিব রাষ্ট্রেও কোনো কোনো এলাকায় টাকার অভাব ঘটে না, কিন্তু শিক্ষার নামে ওই সমুদ্র শুকিয়ে যায়। পাকিস্তানেও নাকি গত দু-দশকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়ে তিরিশে দাঁড়িয়েছে, যদিও লোক সংখ্যা কম; কিন্তু আমরা বিশ্ববিদ্যালয় বাড়াই নি, এমন একটা ভয়ে যেনো বিশ্ববিদ্যালয় বাড়ালে বড়ো একটা ক্ষতি হয়ে যাবে। বিশ্ববিদ্যালয় বাড়লে ক্ষতি হবে তাদের, যারা দখল ক'রে আছে রাষ্ট্র; তাই বাঙলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় বাড়ে না। যে-কটা আছে, সেগুলো বেঁচে আছে ধুঁকেধুঁকে। হঠাৎ সেগুলোতে দেখা দেয় অনির্দিষ্টকাল, মাসের পর মাস বন্ধ থাকে পড়াশুনো; পরীক্ষা ঠিক সময়ে হয় না, হওয়ার পর আর ফল বেরোয়না; জট পাকিয়ে থাকে বিভিন্ন শিক্ষাবর্ষ; ছাত্ররা মাঝে মাঝে মেতে ওঠে আত্মহননে, শিক্ষকেরা দায়িত্ব পালন করে না ঠিকমতো। শিক্ষকদের প্রতিও বিশ্ববিদ্যালয় পালন করে না দায়িত্ব। ধনী ও ক্ষমতাসম্পন্নদের সন্তানেরা এখন আর দেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে না; তাদের কালো টাকা রয়েছে, তাই তাদের সন্তানেরা শ্বেতশুভ্র দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিদ্যার্জন করে। ওই সন্তানেরা গরিব দেশে ফিরবে না, ফিরলে শাসক হয়ে ফিরবে। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এখন আসে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণীর সন্তানেরা, যাদের বিশ্ববিদ্যালেয় আসা ছাড়া কোনো উপায় নেই। আমেরিকার স্বপ্ন তাদের জীবনে পরিহাস, এমনকি ভারতের স্বপ্নও মস্ত কৌতুক। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসে;— তাদের মধ্যে মেধাবীরা চ'লে যায় প্রকৌশলে বা চিকিৎসায়, প্রচুর অর্থের লোভ নিয়ে; যারা আসে বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের জীবনে দুর্দশার শেষ নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে দেখে এখানে আরো বড়ো দুর্দশা অপেক্ষা ক'রে আছে। বিশ্ববিদ্যালয় তাদের বিদ্যাও বেশি দিতে পারে না, স্বপ্ন বা আশা তো দিতেই পারে না। বিশ্ববিদ্যালয় তাদের নিরাশায় পরিপূর্ণ করে তোলে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে মনে হয় বিশাল হাসপাতালের মতো, যে-হাসপাতাল নিজেই শোচনীয়ভাবে রুগ্ন; অন্যের চিকিৎসা কী করবে, তার নিজেরই দরকার গভীর চিকিৎসা। অসংখ্য তার রোগ, অনেক রোগ স্পষ্ট অনেক রোগ প্রচ্ছন্ন; অনেক রোগ তার শরীরে নিয়মিত সংক্রমিত হয় বাইরে থেকে; আর অনেক রোগ সৃষ্টি করে চ'লে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে নিজেই। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আমাদের গৌরব। এখানেই চলে জাতির সৃষ্টিশীলতা ও মননশীলতার চর্চা, এখানেই বিকশিত হয়েছে জাতির স্বাধীনতার স্বপ্ন; এখনো এখানেই লালনপালন করা হয় প্রগতিশীল চেতনা। কিন্তু আমরা কি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে প্রকৃতই বিশ্ববিদ্যালয় করে তুলতে পেরেছি, চেষ্টা করেছি ক'রে তোলার, যেমন পেরেছে পশ্চিমের বহু দেশ? বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আমাদের সমাজের সৃষ্টিপ্রেরণা থেকে জন্ম নেয় নি, আমরা এগুলোকে এনেছি পশ্চিম থেকে; পশ্চিমের শ্রেষ্ঠ উপহার বিশ্ববিদ্যালয়, কিন্তু আজো আমরা বিশ্ববিদ্যালয়কে ক'রে তুলতে পারি নি বিশ্ববিদ্যালয়। আমরা পশ্চিমের সুস্থ বিশ্ববিদ্যালয়কে ক'রে তুলেছি অসুস্থ, নানা রোগে পীড়িত করেছি তাকে; করে তুলেছি নির্জীব, নিষ্ক্রিয়।

জাতির মনন-ও সৃষ্টি-শীলতা বিকাশের কেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়। কোনো জাতি যখন তার ওই প্রতিভার বিকশ ঘটাতে চায়, তখন গড়ে তোলে বিশ্ববিদ্যালয়; তাকে দেয় সমস্ত সুযোগ ও স্বাধীনতা, যাতে সেখানে অবাধে চলতে পারে বিশ্বজ্ঞানের চর্চা। সেখানে চলে বিশ্বজ্ঞান আহরণ ও বিতরণ, সেখানে চলে নতুন জ্ঞান সৃষ্টি। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বাধীনতা দিই নি, সুযোগও দিই নি; বরং আমরা তার স্বাধীনতা ও সুযোগ হরণ করার নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকি দিনরাত। তাই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় কিছু সৃষ্টি করতে পারে নি;—বিশ্ববিদ্যালয় জন্ম দিতে পারে নি বিশ্বমাপের বিজ্ঞানী বা দার্শনিক, অর্থনীতিবিদ বা সমাজতাত্ত্বিক বা সাহিত্যতাত্ত্বিক। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো একরাশ আমলা সৃষ্টি করেছে, কিছু বিপথগামী রাজনীতি ব্যবসায়ী সৃষ্টি করেছে। শিক্ষার্থীদের আমরা কোনো মহৎ আদর্শেও দীক্ষিত করতে পারি নি। এটা বোঝা যায় আমলাদের মুখের দিকে তাকালে; ওই মুখে কোনো আদর্শ নেই, নীতি নেই, আছে শুধু স্বার্থপরায়ণতা। রাজনীতি বিশ্ববিদ্যালয়ের জলবায়ুর মতো;-এখানেই জন্ম হয় রাজনীতি ব্যবসায়ীদের। এখন যারা ব্যবসা ক'রে চলছে, তারা প্রায় সবাই এক সময় আদর্শের শ্লোগান মুখর ক'রে রাখতো বিশ্ববিদ্যালয়ের দশদিগন্ত। তাদের মুখে এখন কোনো আদর্শ নেই, রয়েছে চরিত্রহীনতার বেড়ো দাগ।

যে-বিশ্ববিদ্যালয় কিছু সৃষ্টি করতে পারে নি, তার জ্ঞানার্থীদের মনে সঞ্চার করতে পারে নি কোনো আদর্শ, তার ব্যর্থতা শোচনীয়। এমনও মনে হয় অনেক সময় যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো না থাকলে হয়তো অন্য রকম উপকার হতো সমাজের; বিকাশ ঘটতো না এতো আদর্শহীন অসৎ মানুষের। আমাদের নিরক্ষররাও এতো চরিত্রহীন নয়, যতোটা চরিত্রহীন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উপাধি নিয়ে বেরিয়ে-যাওয়া শক্তিমানেরা। তাহলে কি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মানুষ সৃষ্টি করে না, সৃষ্টি করে একরাশ দক্ষ অমানুষ? তারা চেনে শুধু ক্ষমতা ও অর্থ; মানবিক সমস্ত ভূভাগ অচেনা তাদের কাছে। তারা এ-রোগ কি আয়ত্ত করে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে থেকেই; নাকি তারা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরোয় রোগপ্রতিরোধের কোনো শক্তি না নিয়ে, এবং সমাজে প্রবেশের সাথে সাথে আক্রান্ত হয় সামাজিক সমস্ত অসুখে? কিছুদিন আগে একটা শোচনীয় ঘটনা ঘটেছে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়, একেবারে বিজ্ঞানের কেন্দ্রস্থলে : দুটি ছাত্র রাস্তা থেকে হরণ ক'রে এনে ধর্ষণ করেছে একটি বালিকাকে, আরেকটি পালিয়ে গিয়ে বেঁচেছে তাদের পাশবিকতা থেকে, এবং পুলিশের সাহায্যে উদ্ধার করেছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অসহায় ধর্ষিতাকে। ঘটনার নারকীয়তায় নির্বাক হয়ে গেছে যেনো সবাই , নিন্দা করার ভাষাও হারিয়ে ফেলেছে। ওই ছাত্র দু'টিকে কি ধ'রে নেবো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রের উদাহরণ হিশেবে, না ব্যতিক্রম হিশেবে। তারা একই সঙ্গে উদাহরণ ও ব্যতিক্রম। তাদের একজন ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতির ছাত্র। ওই বিকারগ্রস্তকে কেউ সুস্থ রাখতে পারলো না, না বিশ্ববিদ্যালয় না ইসলাম না সংস্কৃতি। তাহলে বিশ্ববিদ্যালয় তাকে ঋদ্ধ করলো কোন সম্পদে? অসহায় সমাজ যেখানে তাকিয়ে আছে বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র যেখানে ত্রাতারূপে দেখা দেবে, সেখানে সে হয়ে উঠছে পাশবিক পীড়নকারী। এতে বুঝতে পারছি বিশ্ববিদ্যালয়ের রোগ অত্যন্ত গভীর, তার এখন গভীর গভীরতর অসুখ; তার সুনিপুণ চিকিৎসা দরকার অবিলম্বে। পাকিস্তানপর্ব থেকে আজ পর্যন্ত আমরা বিশ্ববিদ্যালয়কে অসুস্থ থেকে অসুস্থ করেছি, আমরা জ্ঞানকে পরিহার করেছি, বিশ্ববিদ্যালয় জুড়ে এনএসএফ ছেড়ে দিয়েছি, ত্রাস ছড়িয়েছি, শিক্ষকদের অনেককে নেমে যেতে দেখেছি, নীতি থেকে নীতিহীনতায়। পড়াশুনোকে আমরা সংকীর্ণ থেকে সংকীর্ণতর করেছি, প্রশাসনকে অযোগ্য ও দুর্নীতিপরায়ণ করেছি, গ্রন্থাগারকে ধুলোমলিন ক'রে তুলেছি। বিশ্ববিদ্যালয়কে যদি বলি দেশের মস্তিষ্ক, তবে মস্তিষ্ক এখন রোগাক্রান্ত; এর সুচিকিৎসা দরকার। যে-জাতির মগজ ব্যাধিগ্রস্ত, তার শরীর সুস্থ হতে পারে না; তার একটিই ভবিষ্যৎ : বিনাশ।

(দুই) কোর্সপদ্ধতি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কয়েক বছর হলো লেখাপড়ার কোর্সপদ্ধতি চালু করেছে। এর পেছনে দর্শনটি কী, জানি না; তবে শুরু থেকেই এটা পছন্দ হয় নি অনেকের, এবং কয়েক বছরেই এর ব্যর্থতা স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছে। কোর্সপদ্ধতির বাইরের রূপটি বেশ ঝকঝকে; তবে একটা নতুন মোড়কে পুরোনো জিনিশ। আগে বিভিন্ন 'পত্র'- এ ভাগ করা হতো বিদ্যাকে, কোর্সপদ্ধতিতে ওই পত্রগুলোকে টুকরো টুকরো করা হয়েছে নানা 'কোর্স'-এ। টুকরো করার সময় বিদ্যার অনেক অংশ বাদ পড়েছে; বেশ ছাটকাট ক'রে পড়ানো হচ্ছে নানা বিষয়। আগে অনার্সে আটটি লিখিত পত্র ছিলো; সেগুলো কেটে, ছাঁটকাট করে করা হয়েছে ষোলটি কোর্স; এবং সাথে তৈরি করা হয়েছে কিছু নতুন কোর্স। ছাত্রদের দেয়া হয়েছে বিকল্প কোর্স নেয়ার সুযোগ। আগে প্রতিটি পত্র ছিলো একশো নম্বরের; এখন প্রতিটি কোর্স হয়েছে পঞ্চাশ নম্বরের। ওই পঞ্চাশ নম্বরকে আবার দু-ভাগ করা হয়েছে। একভাগে রয়েছে কারো ভাষায় 'অনুশীলনী', কারো ভাষায় 'ইনকোর্স', যার জন্যে বরাদ্দ পনেরো নম্বর; আরেক ভাগে রয়েছে লিখিত বার্ষিক পরীক্ষা, যার জন্যে বরাদ্দ পঁয়ত্রিশ। এখন বছরে বছরে পরীক্ষা হয়, বছরে বছরে নম্বর জমে; আর শেষ বছরের পরীক্ষার পর নম্বর যোগ ক'রে ফলাফল ঘোষণা করা হয়। কোর্স পদ্ধতির প্রথম শিকার বিদ্যা : টুকরো টুকরো কোর্স বিষয়কে টুকরো টুকরো করা হয়েছে, আগের পাঠ্য বিষয় থেকে বাদ দেয়া হয়েছে অনেক কিছু, তাই প্রতিটি কোর্স হয়ে উঠেছে ছিমছাম। বেশি পড়াতে হয় না; বেশি বুঝতে হয় না, বেশি উপলব্ধি করতে হয় না। কোর্সে শিক্ষকই হয়ে উঠেছেন পাঠ্যবিষয়। কোনো কোর্সে যা-ই থাক-না-কেনো, সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়; মূল্যবান হচ্ছেন শিক্ষক—তিনি যা বা যতোটুকু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়াবেন, তাই কোর্স। শিক্ষক যদি ক্লাসে আসেন, তবে তাই কোর্স; যদি না আসেন, তবে তাই কোর্স। কোনো শিক্ষক কোর্সের অর্ধেক পড়াতে পারেন, প্রশ্ন করতে পারেন সেখান থেকেই, ছাত্ররাও উত্তর দেয় সেটুকু থেকেই। কোনো বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞান দেয়ার দায় নেই শিক্ষকের; তিনি যতোটুকু দিতে ইচ্ছে করেন, সেটুকুই যথেষ্ট। অনেক শিক্ষক তাই করেন। ছাত্রছাত্রীরা কোনো বিষয় পুরোপুরি জানার আগ্রহ বোধ করে না, শিক্ষক যতোটুকু পড়ান সেটুকুই প্রতিলিপি ক'রে নেয় তারা, মুখস্থ ক'রে ফেলে, পরীক্ষা দেয় ও সম্পূর্ণ ভুলে যায়। স্মরণশক্তি বা মনে রাখা কোর্স পদ্ধতির বিরোধী; কোর্স পদ্ধতির দর্শন হচ্ছে সামান্য শেখো, পরীক্ষা দাও ও ভুলে যাও। প্রথম বর্ষে তারা যা পড়ে, দ্বিতীয় বর্ষে তা মনে থাকে না তাদের, তৃতীয় বর্ষে ওই বিষয়টি এতো পরিচ্ছন্নভাবে বিস্মৃত হয় তারা যে বিষয়টিকে পুরোপুরি নতুন মনে হয় তাদের। বিষয় সম্পর্কে কোনো উপলব্ধি জন্ম দেয়াও কোর্সপদ্ধতির বিরোধী। সাহিত্যের কথাই ধরা যাক। প্রথম বর্ষ অনার্স শ্রেণীতে যখন কোনো ছাত্র ভর্তি হয়, তখন তার সাহিত্যবোধ প্রায় থাকেই না; দ্বিতীয়-তৃতীয় বর্ষে গিয়ে ওই বোধ জন্ম নেয়, সে নিজে বোধ করতে পারে সাহিত্য, মূল্যায়নও করতে পারে কিছুটা। প্রথম বর্ষে ও তৃতীয় বর্ষে রবীন্দ্রনাথ বা শেক্সপিয়র এক রকম থাকে না, ভিন্নরূপে দেখা দেয়। কিন্তু কোর্স পদ্ধতিতে প্রথম বর্ষে যদি রবীন্দ্রনাথ পড়ানো হয়, তাহলে শিক্ষার্থী রবীন্দ্রনাথের কিছুই বোঝে না, যেমন বোঝে না চর্যাপদ বা শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বা বৈষ্ণব পদাবলি। তাই কোর্সপদ্ধতির পড়াশুনো হচ্ছে নির্বোধ পড়াশুনো;—খণ্ডিত, মুখস্থ ও বিস্মৃত। সব বিষয়েই এমন ঘটেছে এখন, কেউ লাভ করছে না তার বিষয় সম্পর্কে মোটামুটি সম্পূর্ণ ধারণা। কোর্সপদ্ধতিতে শিক্ষক দেখা দিয়েছেন একনায়করূপে; ছাত্র অসহায় বন্দী। কোর্সপদ্ধতিতে শিক্ষক ছাত্রকে খামখেয়ালি শিরোপা দিতে পারেন, আবার তাকে নিক্ষেপ করতে পারেন আবর্জনাস্তূপে। তাই ছাত্রেরা শিক্ষকদের কাছে থাকছে দাসরূপে; কেননা তারা জানে শিক্ষকের কৃপায় তাদের ভাগ্যে জুটতে পারে সুন্দর সোনালি নম্বর, তার রোষে মিলতে পারে একটা কদর্য সংখ্যা। অনেক শিক্ষক ঠিকমতো ক্লাস নেন না, আসেন অর্ধেক সময় পেরিয়ে; কিন্তু বেশ আগেই কোর্স শেষ ক'রে ফেলেন। তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্সপদ্ধতি আমাদের দুর্গতজ্ঞানের জগতে সৃষ্টি করেছে আরো দুর্গতি। কোর্সপদ্ধতির প্রশ্নপত্র দেখলেও গা ঘিনঘিন করে বিশ্রী হস্তাক্ষরে লেখা প্রশ্নপত্র দেয়া হয় ছাত্রদের, উত্তর লেখার আগে একবার বমি আসে।

কোর্সপদ্ধতির কুফলের উল্টো পিঠ তার সুফল : এ-পদ্ধতিতে খারাপ ছাত্রদের পক্ষেও প্রথম শ্রেণী পাওয়া সম্ভব; এবং এখন পাচ্ছে। তাই এখনকার প্রথম শ্রেণীপ্রাপ্তরা আর মর্যাদাও পায় প্রথম শ্রেণীর। অনার্সে ষোলটি কোর্সের প্রতিটি কোর্সে রয়েছে পনেরো নম্বরের অনুশীলনী; অর্থাৎ এখন অনুশীলনীর জন্যেই রয়েছে দু-শো চল্লিশ নম্বর, আগে যেখানে ছিলো মাত্র পঁচাত্তর। কোর্সপদ্ধতিতে অনেক অনুশীলনী ক্লাস হওয়ার কথা, কিন্তু হয় না; কোনো কোর্সশিক্ষকের পক্ষেই অতো অনুশীলনী ক্লাস নেয়া সম্ভব নয়; তবে অনুশীলনীতে অনেক ছাত্রই প্রচুর নম্বর পায়। পাওয়ার পেছনে কারণ রয়েছে অনেক, তার অনেকটাই বিদ্যার সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। অনুশীলনীগুলো এখন প্রথম শ্রেণী পাওয়ার চাবি। বার্ষিক লিখিত পরীক্ষায়ও এখন অনেক নম্বর ওঠে। কোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিষয়ে বিষয়টি যতো জটিল বা ব্যাপক হোক, প্রশ্ন করতে হয় পাঁচ ছটি; ছাত্ররা উত্তর দেয় তিনটি বা সাড়েতিনটি। পঁয়ত্রিশ নম্বরের প্রশ্ন করতে গিয়ে দেখা যায় জটিল দুরূহ প্রশ্ন করাই যায় না, করলে অধিকাংশই উত্তর দিতে পারবে না, তাই বেছে সোজা প্রশ্ন করা হয়, সে-সমস্ত প্রশ্ন ফিরে ফিরে আসে। ছাত্ররা আগে থেকেই টের পায় এবার কী কী প্রশ্ন আসতে পারে। তাই ছাত্রদের যেমন ব্যাপকভাবে পড়ানো হয় না, তেমনি তাদের মেধাও যাচাই করা হয় না। পঁয়ত্রিশ নম্বরের উত্তরপত্র মূল্যায়ন করার সময়ও ছাত্রদের কিছুটা বেশি নম্বর দেয়া হয়। প্রতিটি প্রশ্নের মান হয় ন-নম্বরের মতো। ন-তে তিন-চার দিতে খারাপ লাগে বলে অবলীলায় দেয়া হয় পাঁচ-ছয়; কিন্তু আগে বিশে বারো দিতে পরীক্ষকদের হাত কাঁপতো এখনো প্রথাগত পদ্ধতির ছাত্রদের নম্বর দিতে পরীক্ষকেরা কৃপণ, কোর্সপদ্ধতির ক্ষেত্রে অকৃপণ। ফলপ্রস্তুতির যে-রীতি এখন চলছে, তাতে কোনো কোনো ছাত্র এগারো-বারো নম্বর বেশি পেতে পারে এমনিই, যে-নম্বর সে পায় নি। এখন প্রতিটি কোর্সে পরীক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বরকে পূর্ণ সংখ্যায় পরিণত করতে হয়। মনে করা যাক কেউ পেয়েছে ২০.০১; কিন্তু তাকে দিতে হবে ২১। এভাবে ষোলটি কোর্সে কেউ প্রায় ষোল নম্বর বেশি পেতে পারে, দশ-এগারো অনেকেই পায়। এ-নীতিতে নম্বর বাড়ে, ফল ভালো হয়, প্রথম শ্রেণী পায়; কিন্তু পড়াশুনোটি প্রথম শ্রেণীর মানের নয়। কোর্সপদ্ধতিতে যারা প্রথম শ্রেণী পায়, প্রথাগত পদ্ধতিতে তারা অনেকেই শতকরা বায়ান্নো-তিপ্পান্নোর বেশি নম্বর পেতো না। কোর্সপদ্ধতির ফলে উপকার হয়েছে এ-একটিই; কিন্তু এতে বিদ্যার অবমূল্যায়ন ঘটেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোর্স পদ্ধতি শুরু হয়েছিলো বিদ্যার উন্নতির লক্ষ্যে; কিন্তু তা উন্নতি সাধন না ক'রে ক্ষতিসাধন করেছে। কোর্সপদ্ধতির সাথে শিক্ষাবর্ষ-জটের ব্যাপারটিও জড়িত। এখন প্রথম বর্ষ পরীক্ষার ফল না বেরোনো পর্যন্ত দ্বিতীয় বর্ষের ক্লাশ শুরু হয় না, দ্বিতীয় বর্ষের ফল না বেরোলে শুরু হয় না তৃতীয় বর্ষ, আর তৃতীয় বর্ষের ফল না বেরোলে শুরু হয় না দ্বিতীয় পর্ব। ফল প্রকাশ প্রক্রিয়ায় কেটে যায় দু-বছর; ছাত্ররা প্রবীণ হয়ে ওঠে। কোর্স পদ্ধতির ব্যর্থতা এখন এর প্রবক্তারাও বুঝতে পারছেন। কোর্স পদ্ধতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বড়ো রোগ, অভিনব রোগ; এর আশু চিকিৎসা দরকার। আমাদের আবার ফিরে যেতে হবে প্রথাগত পদ্ধতিতে তার ব্যাপকতা, বোধি, উপলব্ধিতে। অবিকল আগের পত্রগুলোকেই পুনর্বাসিত করতে হবে, এমন নয়; পাঠ্যসূচি তৈরি করতে হবে সুচিন্তিতভাবে, কিন্তু জ্ঞান বিতরণ ও অর্জনে প্রয়োগ করতে হবে আগের দর্শন। কোর্সপদ্ধতি আমাদের উপযোগী নয়, এ-পদ্ধতি আমাদের জ্ঞানকে রুগ্ন থেকে রুগ্নতর ক'রে তুলছে। এ-রোগের আশুচিকিৎসা ছাড়া আমাদের বিদ্যার ভবিষ্যৎ খুবই খারাপ।

[তিন] প্রশাসন

পুবে কলাভবন, পশ্চিমে রেজিস্ট্রারের কার্যালয়; মাঝখানে একটা ছোটো উদ্যান। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও প্রশাসনের মধ্যে একটি বাগানের ব্যবধান বা দূরত্ব; কিন্তু পুবের ভবন থেকে পশ্চিমের ভবনে একটি পত্র পাঠিয়ে কেউ যদি উত্তরের প্রতীক্ষায় থাকেন, তবে তার পুরো জীবন অতিবাহিত হয়ে যেতে পারে উত্তর আসার অনেক

জলপাই রঙের অন্ধকার-এর পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আগেই। জীবনকে সংক্ষিপ্ত জেনে তিনি যদি খোঁজ নিতে যান তাঁর নিরুদ্দেশ পত্রটির, তাহলে কেউ খোঁজ দিতে পারবে না। ওই পত্র হয়তো সমস্ত বাস্তব ঠিকানা পেরিয়ে প্রবেশ করেছে মহাকালের বাক্সে। দু-বছর আগে আমি একটি পত্র লিখেছিলাম, প্রতিদিনই ওই পত্রটিকে মনে পড়ে আমার, কিন্তু জেনে গেছি ওই পত্রের উত্তর কোনোদিন পাবো না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন মহাজাগতিক কৃষ্ণগহ্বরের মতো, যা অবলীলায় গ্রাস করে আমার পত্রটির মতো অসংখ্য পত্র, আবেদন, লিখিত বস্তু। তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ম হচ্ছে আবেদনকারী তাঁর আবেদনপত্র নিয়ে ঘুরবেন টেবিলে টেবিলে, কাজ করিয়ে নেবেন হাতে হাতে। বিশ্ববিদ্যালয়-প্রশাসন লিখিত বস্তুকে গুরুত্বপূর্ণই মনে করে না বা মনে করে লিখিত বস্তুমাত্রই অপাঠ্য; তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ব্যক্তিটি। তাঁর শারীরিক উপস্থিতি ছাড়া কোনো দাম নেই তাঁর লিখিত বস্তুর। লিখিত বস্তুকে যেনো পুরোপুরি অবিশ্বাস করে প্রশাসন, বিশ্বাস করে ব্যক্তির উপস্থিতিকে। এটা শুধু বিশ্ববিদ্যালয়েরই বিশ্বাস নয়, পুরো বাঙলাদেশের প্রশাসনের বিশ্বাসই এই। বাঙলাদেশের প্রসাশনযন্ত্রসম্পূর্ণরূপে নিরক্ষর; তা লেখায় বিশ্বাস করে না, পড়তে পারে না কোনো লিখিত বস্তু; তাই কোনো লিখিত বস্তু দেখলে সেটিকে কাগজচাপা দিয়ে লেখকটির প্রত্যাশায় থাকে এদিক দিয়ে আমাদের আমলাতন্ত্র এখনো নিরক্ষর চাষীসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি আবেদনপত্র লিখে ঘুরতে হবে টেবিলে টেবিলে। তবে একটি সাধারণ ও সরল সমস্যা হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনভবনের টেবিলগুলো প্রায়ই শূন্য থাকে, কাউকে পাওয়া যায় না টেবিলের আশেপাশে। কেউ হয়তো অন্য কক্ষে গেছে, অর্থাৎ আসবে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনভবনটিকে কখনো কখনো একটি অতিকায় কাছিমের মতো মনে হয়, ধীরতায় এটি অদ্বিতীয়। প্রশাসনভবনের কয়েকটি তলা একবার ঘুরে এলে বোঝা যায় প্রশাসকের কোনো অভাব নেই, বিচিত্র মানের প্রশাসকের ভিড়ে ওই ভবনটি নিঃশ্বাস নেয়ার সুযোগ পাচ্ছে না। ঘরে ঘরে টেবিলের পর টেবিল, টেবিলের ওপর ফাইলের ওপর ফাইল; তবে কিছুই সচল নয়, কারো নিজস্ব সক্রিয়তা নেই, তাকে পেছন থেকে না ঠেললে একটুও নড়ে না। একটি অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায় যে ওই ভবনে কাজের থেকে কর্মচারী ও কর্মকর্তা অনেক বেশি। আমি কোনো হিশেব নেই নি, তবে এ-অভিযোগটিকে বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় যখন দেখি কোনো কাজ হচ্ছে না। বেশি কর্মচারী ও কর্মকর্তা মানেই হচ্ছে কম কাজ; যে-কাজ একজনে চমৎকারভাবে করতে পারেন, তা হয়তো চারজনে মিলে করছেন, পাকিয়ে তুলছে জট; যে-সিদ্ধান্ত নেয়া যেতো দ্রুত , তা ধীরস্থির সিদ্ধান্তের জালে আটকা পড়েছে। অধ্যাপকেরা মাঝে মাঝেই অভিযোগ করেন যে প্রশাসনভবনের কর্মচারী ও কর্মকর্তারা তাঁদের সুযোগ পেলেই অপমান করেন। এ-অভিযোগও মিথ্যে নয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা দেশের অন্য যে-কোনো কার্যালয়ে গেলে যে-মর্যাদা পান, তা পান না তাঁদের নিজেদের কার্যালয়ে। শিক্ষক ও প্রশাসকদের মধ্যে একটি গোপন দ্বন্দ্ব অনেক দিন ধ'রেই চলছে। শিক্ষকরা মনে করেন কোনো কাজ নিয়ে প্রশাসনভবনে গেলে তাঁরা যোগ্য সম্মান পাবেন, কিন্তু হয়তো গিয়ে দেখেন নিম্নতম কর্মচারীটিও তাঁকে মূল্য দিচ্ছেন না। কর্মচারীরা মূল্যবান মনে করেন শক্তিমানদের, যাঁর কোনো শক্তি নেই তাঁর কোনো মূল্য নেই। কর্মচারী ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কর্মকর্তারা জানেন কোন শিক্ষকেরা শক্তিমান; তাঁদের তাঁরা খুবই সম্মান করেন। সিন্ডিকেট সদস্য হ'লে খুব সম্মান পাওয়া যায়। শক্তি ও সম্মানের একটি সাম্প্রতিক গল্প এমন: একজন সহযোগী অধ্যাপকের বাসার একটি সিংক ভেঙে গেছে, তাই তিনি সেখানে আরেকটি সিংক বসানোর জন্যে চিঠি লিখেছেন, যোগাযোগ করেছেন প্রকৌশল বিভাগের সাথে। তাঁকে জানানো হয়েছে সিংক একবারের জন্যেই দেয়া হয়, ভাঙা সিংকের জায়গায় নতুন সিংক বসানোর কোনো নিয়ম নেই বিশ্ববিদ্যালয়ে। এর মাস খানের পরে ওই সহযোগী অধ্যাপক দেখেন তাঁর বাসায় একটি সিংক এসে হাজির হয়েছে। চেয়েও পাওয়া যায় নি, তা এখন নিয়ম ভেঙে উপস্থিত হয়েছে। কী কারণ? কারণ তিনি দু-একদিন আগে সিন্ডিকেটে নির্বাচিত হয়েছেন। এই হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিপুণ আমলাতন্ত্র।

বিশ্ববিদ্যালয়-প্রশাসনের উচ্চতম তিনজন আজকাল: উপাচার্য, সহউপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন শিক্ষকদের মাঝ থেকেই। তাঁরা ওই পদে যাওয়ার পর পরিণত হন প্রশাসকে, অনেকেই আর ফিরে আসেন না শিক্ষকতায়। অনেকে ফিরে আসার পথ রাখেন না, অনেকেই ফিরে আসাটাকে গৌরবজনক মনে করেন না, অনেকে শিক্ষকতায় থেকে প্রশাসনে গিয়ে নিজেকে ধন্য মনে করেন। যাঁরা ফেরেন না শিক্ষকতায়, তাঁরা সারা জীবন প্রতারণা করেছেন বিদ্যার সাথে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন হয়তো ভালো ছিলো শ্বেতকায়দের কালে, স্বৈরাচারী হয়ে উঠেছিলো পাকিস্তানপর্বে; আর অনিয়মিত হয়ে উঠেছে গত দু-দশকে। শক্তিমানেরা খেয়ালখুশি মতো নিজেদের লোক ঢুকিয়েছেন এখানে সেখানে, ঢোকানোর জন্যে অপ্রয়োজনীয় পদের পর পদ সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু ওই পদগুলোর জন্যে কোনো কাজের ব্যবস্থা করেন নি। প্রশাসনভবনটির ক্রিয়াকলাপ দেখলে মনে হয় এর ওপর সম্ভবত কারো কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই; নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে খুব বিপদ বেধে যাবে, এমন একটা ভয়ে উচ্চতম প্রশাসকেরা যেনো শংকিত। ওখানে অনেক পদ জন্ম নিয়েছে বলে বিভিন্ন পদের মূল্যও কমে গেছে; এবং যে-পদটির মূল্য সবচেয়ে বেশি কমেছে, সেটি রেজিস্ট্রারের পদ। রেজিস্ট্রারের একটি পদ যে বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে, এটাই এখন মনে পড়ে না। খুবই বাহুল্য ব'লে মনে হয় পদটিকে। ওই পদে নিযুক্ত ব্যক্তি নিশ্চয়ই নানা কাগজে স্বাক্ষর করেন, কিন্তু কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ পান না। তাঁরই অধীনে থাকার কথা প্রশাসনভবনটি; তবে তিনিই এখন প্রশাসনভবনের অধীনে। একজন অসহায় রেজিস্ট্রারের অধীনে যাঁরা আছেন, তাঁরা যে খুবই স্বাধীন হবেন, কারো কাছে কোনো জবাবদিহি করবেন না, এটা বোঝা যায়, এবং এর ফলে যে-প্রশাসনিক শিথিলতা ও অরাজকতা দেখা দেবে, তা নিশ্চিত। তাই দেখা যাচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে; সম্ভবত সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়েই। রেজিস্ট্রারের অনেক দায়িত্বই সম্ভবত এখন উপাচার্য বা সহউপাচার্য পালন ক'রে থাকেন। এর ফলে বিশেষ ক'রে উপাচার্যের দায়িত্ব অনেক বেড়ে গিয়েছে। অনেক বছর ধ'রেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদটি হয়ে দাঁড়িয়েছে সংকটনিরসক বা ব্যবস্থাপকের পদ। চাঁদে চাঁদে নানা সংকট ঘনীভূত হয়ে ওঠে বিশ্ববিদ্যালয়ের আকাশে—মিছিলে হামলা চলে, কেউ ছাত্রাবাসের অফিস কক্ষে তালা ঝুলিয়ে দেয়, কোথাও ছাত্র আত্মহত্যা ক'রে সকলকে দুর্যোগে ফেলে যায়, কোথাও প্রাধ্যক্ষকে কাজে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যোগ দিতে দেয় না ছাত্ররা;—উপাচার্য দিনরাত ব্যস্ত থাকেন এসব সংকট নিয়ে। এগুলোর সুন্দর সমাধান করতে পারলে তিনি স্বস্তি বোধ করেন, এ-যাত্রা টিকে গেলেন ব'লে ধ'রে নেন; কিন্তু ভয়াবহ সংকটে একসময় অসহায় হয়ে পড়েন তিনি, বা সংকটসমাধানে আর সুখ পান না। এতো সংকটের মধ্যে প্রশাসনের দিকে তাকানো অসম্ভব হয়ে পড়ে তাঁর পক্ষে। তাঁর মাথার ওপর প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলার এক বিশাল পর্বত। অনেক বছর এই রোগের কোনো চিকিৎসা হয় নি, রোগ বেড়েই চলছে; বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সুষ্ঠু চিকিৎসা— প্রশাসনভবনটির কক্ষে কক্ষে রোগ; এর নিরাময় দরকার।

[চার] গ্রন্থাগার

কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যার চর্চা কতোটা হচ্ছে, তা মাপা যায় তার গ্রন্থাগার দেখে। কী পরিমাণ বইপত্র আছে গ্রন্থাগারে, তার কতোটা আধুনিক কতোটা প্রাচীন, কী পরিমাণ জ্ঞানার্থী নিয়মিত আসে সেখানে, তারা সহযোগিতা পায় কতোটা, তা দেখে বোঝা যায় ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞান অর্জন ও বিতরণের প্রক্রিয়াটি; এমনকি পরিমাপও করতে পারি তার বিদ্যা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের রয়েছে দুটি ভবন;—একটি সাধারণ গ্রন্থভবন, এটিই পরিচিত বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার হিশেবে; অন্যটি বিজ্ঞান গ্রন্থাগার। এক সময়ের পাবলিক লাইব্রেরির সাথে আরেকটি তেতলা দালান যোগ করে গড়ে উঠেছে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের মূল ভবনটি। চমৎকার স্থানে অবস্থিত এটি একটু পশ্চিমে কলাভবন, পুবে আকর্ষণীয় উদ্যান, দক্ষিণে আকর্ষণীয়তর রোকেয়া ছাত্রীনিবাস ও ছাত্রশিক্ষক কেন্দ্র। দুটি অট্টালিকার সমষ্টি এটি, পুবেরটিতে চলে প্রশাসন, পশ্চিমেরটিতে পড়াশুনো। ভবনটির চারপাশ সব সময়ই জীবনমুখর; এর ভেতর পাঠকের অভাব ঘটে প্রতিদিনই, তবে চারপাশে প্রেমিক ও প্রমোদার্থীর অভাব কখনোই ঘটে না। ভবনটির দোতলা-তেতলায় রয়েছে বইপত্র, ছাত্রদের পড়াশুনোর ব্যবস্থা; একতলায় রয়েছে পড়াশুনোর কিছুটা আয়োজন; দক্ষিণে ও উত্তরে রয়েছে পুরোনো ও নতুন পত্রপত্রিকা পড়ার ব্যবস্থা। ঠিক কী পরিমাণ বইপত্র রয়েছে, তা হয়তো জানে না কেউ, যদিও কেউ কেউ বইপত্রে মনগড়া পরিসংখ্যান দিয়ে থাকেন। ভবনটিতে ঢুকলে জ্ঞানার্থী বেশি চোখে পড়ে না, দুপুরের পর তাদের সংখ্যা খুবই কমে যায়, যদিও ভবনের বাইরে প্রেমার্থীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। কিছু ছাত্রকে পড়তে দেখা যায় দোতলা-তেতলার উত্তর দিকে, পড়ার ভঙ্গি দেখে বোঝা যায় বইয়ের পাতায় মন নেই, অন্য কোথাও পড়ে আছে হৃৎপিণ্ডটি, শুধু বাহ্যিক দেহখানি ঢুকেছে গ্রন্থাগারে। একতলার আকরগ্রন্থের কক্ষটিতে কিছু ছাত্রছাত্রী দেখা যায়; তারা বইয়ের পাতায় নিবন্ধ থাকার চেয়ে সরবে পরস্পরের দিকে নিবন্ধ থাকতেই ভালবাসে। ওই ভবনটিতে অধ্যাপকদের সাক্ষাৎ পাওয়া ভাগ্যের কথা। মাঝে মাঝে প্রভাষকদের মুখ চোখে পড়ে, সহকারী অধ্যাপকদের কারো কারো মুখও দেখা যায়; তবে বিখ্যাত অধ্যাপকদের ওই ভবনে দেখা যায় না। গত দশ বছরে আমি তাঁদের মতো দু-তিনজনকে গ্রন্থাগারে দেখেছি। অর্থ্যাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্রদের কাছে গ্রন্থাগারটি প্রিয় ভবন নয়, এখানে আসার জন্যে তাঁরা আবেগ বোধ করেন না, প্রয়োজনও বোধ করেন না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিক্ষকদের শতকরা পাঁচভাগ হয়তো নিয়মিত আসেন গ্রন্থাগারে, হয়তো ছাত্রদের দশভাগ আসে নিয়মিত। এ থেকেই অনুমান করতে পারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যার অবস্থাটি বিশেষ ভালো নয়; এখানে জ্ঞান হয়তো মোটেই সৃষ্টি হচ্ছে না, আর অর্জনও বেশি হচ্ছে না। বিজ্ঞান গ্রন্থাগাটিরতেও জ্ঞানীদের যাতায়াত কম। ওটা সব সময় নিঝুম হয়ে পড়ে থাকে, ভেতরে মানুষের ছায়া মাঝে মাঝে দেখা যায়। মূল ভবনটির দোতলা-তেতলায় কয়েক হাজার বই আছে; বিশ্ববিদ্যালয়ে যতো বিদ্যা দান করা হয় প্রায় সমস্ত বিদ্যার বই এ-দু-তলায়। তাই কোনো বিদ্যারই পর্যাপ্ত বই নেই। কোনো পুরোনো বই খুঁজলে পাওয়া যায় না, নতুন বই খুঁজলে পাওয়া যায় না; তবে যে-বই খুঁজছি না তা পাওয়া যায়। অনেক বাজে বই প'ড়ে আছে থরে থরে, কিন্তু কাজের বই নেই। প্রয়োজনীয় বই পাওয়ার জন্য গ্রন্থাগারটি নয়, গ্রন্থাগারটি একটি এলোমেলো বইয়ের সংগ্রহাগার। ক্যাটেলগে নাম আছে বইয়ের, কেউ সে-বই ঋণ করে নি, কিন্তু সে-বই কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাই ভবনটিতে ঢোকার সাথে সাথে বিরক্তি জন্মে।

ভবনটির দোতলা-তেতলায় শিক্ষকেরা ও গবেষকেরা ঢুকতে পারেন, বই খুঁজে নিতে পারেন নিজেরা। তবে ওখানে যাওয়াই একটা শাস্তি। কোনো পাখা ঘোরে না ওখানে, তাই ওখানে যাওয়ার সাথে সাথে দোজখের গরম পাঠককে পোড়ায়। আলো এমনভাবে জ্বলে যেনো মহাজগতের এ-প্রান্তে সে-প্রান্তে জ্বলছে দু-তিনটি তারা। তারপর রয়েছে বইয়ের মলাটে ধূলোর প্রাগৈতিহাসিক আস্তরণ। তাক থেকে বই টানার সঙ্গে সঙ্গে একরাশ আণবিক ধুলো ছুটে আসে পাঠকের দিকে, আক্রমণ করে তার চোখ ও নাসিকামণ্ডলকে; তাঁর হাতের তালুয় এমন কালি জমে যে মনে হয় যেনো তিনি এইমাত্র চুলো পরিষ্কার করে এলেন। কয়েক মাস নিয়মিত ওই ভবনে বই খুঁজলে ধুলোবিরাগরোগে আক্রান্ত না হয়ে থাকা অসম্ভব।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অনেকেই এ-রোগে ভোগেন, সর্দিগ্রস্ত হন, এর মূলে রয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার। দোতলা-তেতলায় পড়াশুনোর একটু ব্যবস্থা রয়েছে, গবেষকদের জন্যে ছোটো কক্ষ রয়েছে। ওখানে পড়াশুনো করা অসম্ভব। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এতো বছরেও জ্ঞানার্থীদের জন্যে একটি আরামদায়ক গ্রন্থাগার সৃষ্টি করতে পারে নি। চারদিকে অনেক কিছুই শীততাপনিয়ন্ত্রিত হয়ে যাচ্ছে, চণ্ডালেরাও শীততাপনিয়ন্ত্রিত না হয়ে কর্ম সম্পন্ন করতে পারছেন না; কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে পাখাগুলোও ঘুরে না, সেখানে ঠিকমতো আলোও জ্বলে না। গ্রন্থাগারটিকে কি মুক্ত করা যায় না আদিম ধূলোকণা থেকে? এখানে কি জ্বালা যায় না স্নিগ্ধ আলো? শীতাতপনিয়ন্ত্রিত? ওটা কালোবাজারিদের জন্যে; জ্ঞান চর্চার মতো একটা বাজে ব্যাপারে টাকা ব্যয় করাটা বাড়াবাড়ি মনে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সম্ভবত বই খাওয়ার অভ্যাসও রয়েছে; বিশ বছর আগে যে-বই ছিলো, তা তো পরিপাক হয়ে গেছেই; এমনকি কয়েক সপ্তাহ আগে যে-বই পড়েছি, কীভাবে যেনো তাও নিরুদ্দেশ হয়ে যায় এখান থেকে। দোতলা-তেতলায় কিছু কর্মচারী রয়েছে, যারা পাঠকদের বই এনে দেয়। আমাদের ছাত্রাবস্থায় তাদের অনেকে এমন দক্ষ ছিলো যে বইয়ের নাম বললেই নিয়ে আসতো, কেউ কেউ আমাদের মুখ দেখলেই নিয়ে আসতো যে-বইটি পড়বো। এখন সেখানে অনেককে দেখি, যারা বানান ক'রে বইয়ের নাম পড়ে, যাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাছে রবীন্দ্রনাথও অচেনা। শুনেছি শক্তিমানদের বাড়ির গৃহপরিচারকেরা এখন এসব চাকুরি পাচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের অসংখ্য রোগের মূল কারণটি সম্ভবত হচ্ছে কোনো গ্রন্থাগারিক নেই। কয়েক বছর আগেও দেখেছি কোনো কোনো অধ্যাপক পালন করেছেন গ্রন্থাগারের দায়িত্ব। ওই অধ্যাপকদের অনেকে দায়িত্ব পাওয়ার আগে ও পরে কখনো পড়াশুনোর জন্যে গ্রন্থাগারে আসেন নি। তাঁরা কিছু বাড়তি বেতন পেয়েছেন, কিছুটা সর্দারি করেছেন, কিছুটা ক্ষতি করেছেন গ্রন্থাগারের। কয়েক বছর আগে একজন গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হয়েছিলেন, যিনি এক বছরেই পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। ওই গ্রন্থাগারিকের নানা বাতিক ছিলো, কাজ জটিল করারও একটা নিজস্ব পদ্ধতি ছিলো। এখন তিনি নেই, আছেন ভারপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক। শুনেছি গ্রন্থাগারের ভেতরে শক্তির লড়াই বেশ তীব্র; এতে কেউ হয়তো জিতবেন, কিন্তু গ্রন্থাগারটির বিজয়ের কোনো সম্ভাবনা নেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে-আকার, তার শিক্ষকের যে-সংখ্যা, তাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের এখনকার গ্রন্থাগারের থেকে পাঁচগুণ বড়ো গ্রন্থাগার দরকার। পুরোনো মূল্যবান বইপত্র এখন সংগ্রহ করার উপায় নেই, কিন্তু সেগুলোর প্রতিলিপি বা মাইক্রোফিল্ম সংগ্রহ করা খুবই দরকার; এবং সংগ্রহ করা দরকার সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ নতুন বই। গ্রন্থাগারটি চরিত্রে ছাত্রদের গ্রন্থাগার; এটি গবেষকের গ্রন্থাগার নয়। এটিকে গবেষকের গ্রন্থাগার করে তোলা দরকার অবিলম্বে। এমন একটি গ্রন্থাগার চাই যেখানে পাবো প্রয়োজনীয় সমস্ত পাঠ্যবস্তু, পাবো জ্ঞানার্জনের পরিবেশ, পাবো আবহাওয়া, ও দরকারি সাহায্য। এর সামান্যই পাওয়া যায় গ্রন্থাগারে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার এখনো একটা মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার; বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার নয়। তাহলে কি আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্ববিদ্যার পোশাকে বিতরণ ক'রে চলছি মহাবিদ্যালয়ের বিদ্যা?

[পাঁচ] শিক্ষকদের দুরবস্থা

দারিদ্র্য আমাদের জাতীয় পতাকা, দারিদ্র্য আমাদের জাতীয় সঙ্গীত। দারিদ্র্যের অভাব নেই বাঙলায়; তবে দরিদ্ররা সাধারণত নিরক্ষর, শিক্ষিতরা সাধারণত গরিব নয়। এ-সাধারণ সূত্রেরও ব্যতিক্রম রয়েছে। আমাদের সমাজে রয়েছে একটি শিক্ষিত দরিদ্র শ্রেণী; শ্রেণীটি বিখ্যাত ও ঐতিহাসিকভাবে দরিদ্র;—তাঁরা শিক্ষক। শিক্ষিত ও দরিদ্র শাশ্বত সম্পর্কে জড়িত এখানে; শিক্ষকমাত্রই বিবাহিত দারিদ্র্যর সঙ্গে, এ-বিবাহে কোনো বিচ্ছেদ নেই। শিক্ষিত দরিদ্রদের দেখতে হ'লে তাকাতে হবে আমাদের প্রাথমিক, উচ্চ ও মহাবিদ্যালয়ের দিকে; আর যদি মন ভ'রে দেখতে চাই দেশের উচ্চতম শিক্ষিত দরিদ্রদের, তবে তাকাতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দিকে। উচ্চতম শিক্ষা কীভাবে দেখা দেয় অভিশাপরূপে, ও মানুষকে পরিণত করে উচ্চতম দরিদ্রে, তার রূপ দেখতে পাই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মুখের দিকে তাকিয়ে। তাঁদের অধিকাংশই দেশের শ্রেষ্ঠ মেধাবী, প্রথম হয়েছেন শ্রেণীতে-শ্রেণীতে, বাক্স ভ'রে ফেলেছেন প্রথম বিভাগ ও শ্রেণীর অভিজ্ঞানপত্রে, ডক্টরেট করেছেন অনেকেই; এবং আখেরে পরিণত হয়েছেন প্রথম শ্রেণীর দরিদ্রে। প্রথম শ্রেণীর অভিজ্ঞানপত্রগুলোকে নর্দমায় ছুঁড়ে ফেলে তাঁরা যদি দারোগা হতেন, তবে চমৎকার থাকতেন; যদি আমলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হতেন, জীবনটা তাঁদের উত্তম হতো; কালোবাজারে নামলে ঝকঝকে জীবন কাটাতেন; প্রভুপদনির্ভর রাজনীতি করলে শক্তি ও সম্পদে থাকতেন; এমনকি কাঁচাবাজারে মুদিদোকান দিলেও উচ্চতম শিক্ষিত দরিদ্রের কলঙ্ক বহন করতে হতো না তঁদের। আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্র শিক্ষকদের দরিদ্র দেখতে ও দরিদ্র রাখতে পছন্দ করে। এ-সমাজ বিশ্বাস করে যে শিক্ষিত বস্তিতে থাকবে আর কালোবাজারি থাকবে বারিধারায়। এ-সমাজ একজন সচ্ছল শিক্ষক দেখলে মর্মাহত হয়, আর দরিদ্র শিক্ষক দেখলে আমাদের নৈতিকতা ও সামাজিক মূল্যবোধ অটল আছে জেনে স্বস্তি পায়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের এ-সমাজ ভিখিরিদের শ্রেণীতেই ফেলে, তাঁরা একদিন বিনাচিকিৎসায় মারা যাবে ভেবে এ-সমাজ নিশ্চিন্ত; উচ্চ ও মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দেখে করুণার চোখে; আর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একটু সমীহ করে, কিন্তু সমাজ জানে যে শিক্ষক হচ্ছে শিক্ষক। আমাদের প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শ্রেণীগত কোনো পার্থক্য নেই, মাত্রার পার্থক্য রয়েছে কিছুটা যে-মেধাবী তরুণটি দারোগা বা শুল্কপরিদর্শক বা আমলা না হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকলো আজ, আগামী তিরিশ বছরে সে অনেক জ্ঞান অর্জন করবে, ডক্টরেট নেবে, অধ্যাপক হবে; কিন্তু কখনো স্বচ্ছল জীবন পাবে না। তার সারাটি জীবন কাটবে দুর্দশায়। বিশ্ববিদ্যালয়, অর্থাৎ সমাজ ও রাষ্ট্র একজন অধ্যাপককে কী দেয়? কিছুই দেয় না। প্রভাষক বা সহকারী অধ্যাপকের কথা বলছি না, বলছি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পদ অধ্যাপকের কথা। বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সামান্য বেতন দেয়, আর কিছু দেয় না। বিশ্ববিদ্যালয় তাকে বসার জন্যে একটি ছোটো নোংরা ঘর দেয়, একটা সস্তা চেয়ার দেয়, একটা ময়লা টেবিলে দেয়। শিক্ষকদের সিগারেট খাওয়া সম্ভবত নিষেধ, তাই তাঁকে একটা ছাইদানিও দেয়া হয় না। টেলিফোন? না, অধ্যাপকের কোনো টেলিফোন দরকার নয়; টেলিফোন দরকার কেরানির। তাঁর বাসায় টেলিফোন? এটা এক চরম অনৈতিক ভাবনা। অধ্যাপকের বাসায় কেনো টেলিফোন থাকবে? ওটা থাকবে প্রয়োজনীয় কর্মীদের বাসায়। অধ্যাপক অপ্রয়োজনীয়, তার বাসায় টেলিফোন অত্যন্ত অপ্রয়োজনীয়। প্রশ্ন হচ্ছে তাঁর বাসাই আছে কিনা? প্রভাষক তো সামান্য বস্তু, একজন অধ্যাপককে বাসা দেয়াও বিশ্ববিদ্যালয় ও সমাজের দায়িত্ব নয়। তিনি কোথায় থাকবেন? বস্তিতে থাকতে পারেন, তাতে সমাজের কোনো আপত্তি নেই। যানবাহন? অধ্যাপকদের আবার যানবাহন কিসের? তিনি হাঁটবেন, কুলোলে রিকশায় চড়বেন; নইলে বাসে চাপবেন। যে-অধ্যাপক গাড়ির কথা ভাবেন, তিনি পাপিষ্ঠ, নৈতিক স্খলনগ্রস্ত। গাড়ি আমলাকামলাদের জন্যে, অধ্যাপকদের মরার জন্যে সরকারি হাসপাতালে গণকক্ষ রয়েছে। সমাজ একজন অধ্যাপককে কিছু টাকা দিয়ে বিদায় করে দেয়, পথ দেখতে বলে, ও দিয়ে যেভাবে পারো মরতে বলে। সমাজ অধ্যাপকদের আশ্রয়দাতা নয়, অথচ তাঁর কাছে আশা করা হয় শ্রেষ্ঠ জ্ঞান। হ্যাঁ, বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকটি ধান্দাবাজ অধ্যাপক মিলবে, যাঁরা অধ্যাপক নামটি ভেঙে খান; ছোটেন প্রজেক্ট থেকে প্রজেক্টে, দালালি থেকে দালালিতে। তাঁরা ভালো আছেন, কিছুটা ভালো আছেন; কিন্তু দারোগার মতো ভালো নেই।

অন্যান্য পেশার সাথে তুলনা করলে ভয়াবহভাবে ধরা পড়ে অধ্যাপনার শোচনীয়তা। তিনটি পেশার তিনব্যক্তির মধ্যে একটু তুলনা করা যাক, দেখা যাক এ-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনজনের জন্যে কী ব্যবস্থা করেছে আমাদের সমাজরাষ্ট্র? তাঁদের একজন সচিব, একজন বিচারপতি, একজন অধ্যাপক। সচিব ছাত্রজীবনে মেধাবী ছিলেন, যোগ দিয়েছিলেন আকর্ষণীয় সিভিল সার্ভিসে। শুরু থেকেই তিনি রয়েছেন নানা সুবিধাজনক পদে, সেবা করেছেন প্রতিটি সরকারের। বেতন তিনি অধ্যাপকের থেকে বেশি পান নি, কিন্তু আনুষঙ্গিক সুবিধা পেয়েছেন ও নিয়েছেন একশো গুণ। অবৈধ আয়ের তার সুযোগ ছিলো অশেষ, তিনি সম্ভবত তার সদ্ব্যবহার করেছেন। সচিব পদে পৌঁছাতে পৌঁছাতে তিনি অঢেল সম্পদশালী হয়েছেন যদিও মাসিক বেতন তার ছ-হাজার টাকা। তিনি তার বেতনের কথা ভাবেনই না, ওতে তাঁর চারদিনও চলে না। তিনি যে-সমস্ত সুযোগসুবিধা পান ও নেন, তার মূল্য লাখ টাকা। আরো আছে লাখ লাখ টাকা, নাকি কোটি টাকা? তিনি সারাজীবন কি দিয়েছেন সমাজরাষ্ট্রকে? কিছুই দেন নি তিনি, শুধু নিয়েছেন; অবসর পাওয়ার পরও নেবেন। বিচারপতি ছাত্রজীবনে হয়তো মেধাবী ছিলেন না, তাই গিয়েছিলেন আইনের দিকে। ওকালতি করে তিনি অঢেল সম্পদ জমিয়েছেন, পরে বিশেষ বয়সে সম্মানের জন্যে বিচারপতি হয়েছেন। তার বেতন বেশ গোপন ব্যাপার, তবে তা বিশ হাজার টাকার মতো হবে। তাঁকে বাড়িভাড়া দেয়া হয় পনেরো হাজার টাকা; গাড়ি, ফোন, সহকারী, প্রহরীর সুযোগ পান তিনি বিনে পয়সায়; অবসরের পরও পাবেন। সব মিলে মাসিক আয় তাঁর লাখ টাকার মতো। সমাজরাষ্ট্রকে তিনি কী দিয়েছেন? এখনো কিছু দেন নি; তবে অবসর নেয়ার পর রাজনীতিতে যোগ দিয়ে দেশকে কিছু দেয়ার কথা হয়তো ভাবছেন তিনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হয়তো পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছেন, গবেষণা করেছেন, পিএইচডি করেছেন। কিছু বইপত্র লিখেছেন। তাঁর বেতন পাঁচ হাজার সাতশো থেকে ছ-হাজার হ'তে পারে। তিনি বাড়িভাড়া পান আড়াই হাজার টাকার মতো, আর সব মিলে পান তিন-চারশো টাকার মতো। তিনি সমাজরাষ্ট্রকে কী দিয়েছেন? তিনি জ্ঞান দিয়েছেন, যা ছাড়া এ-বিকল সমাজ আরো বিকল হতো। ফাইল লেখা বা রায় লেখা সম্ভবত জ্ঞান দেয়ার থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ; তাই সচিব ও বিচারপতিকে সুযোগসুবিধায় ভ'রে দেয় সমাজ, আর একজন অধ্যাপককে দেয় আট-ন হাজার টাকা। তাঁরা তিনজন বাস করেন একই সমাজে, একই বাজার থেকে চাল কেনেন, একই সড়কে চলেন (না, অধ্যাপক তাঁদের সব সড়কে চলতে পারেন না), একই রোগে ভোগেন; কিন্তু যাপন করেন ভিন্ন জীবন। দুজন স্বর্গে থাকেন, অধ্যাপক থাকেন নরকে। অধ্যাপকের অপরাধ তিনি পেশা হিসেবে নিয়েছেন শিক্ষকতাকে। তিনি অন্য কোনো পেশায় গেলে সম্পদে থাকতে পারতেন, যেমন সম্পদে আছেন তার থেকে নিকৃষ্টরা। দুর্দশাগ্রস্ত একজন অধ্যাপকের কাছ থেকে কী প্রত্যাশা করতে পারি আমরা? শ্রেষ্ঠজ্ঞান, বিশ্বজ্ঞান, মহৎ জ্ঞান? এসব কিছুই আশা করতে পারি না। আমাদের শিক্ষার কর্কটরোগ আমাদের শিক্ষকদের দুরবস্থা। এ-রোগের চিকিৎসা না হ'লে এরপর প্রথম শ্রেণী পেয়ে তরুণরা দারোগা হবে, আর তৃতীয় শ্রেণী পেয়ে অধ্যাপক হবে। তখন আমরা পৌঁছোবো আমাদের গন্তব্যে, যখন আমাদের কোনো বিশ্ববিদ্যালয় দরকার হবে না, বিশ্ববিদ্যালয় থাকবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~